৬

আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা

ভূমিকাঃ

মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র ও গির্জা কর্তৃক শাসিত খ্রিষ্টীয় সাম্রাজ্যের অধীনে মানুষ ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ধর্মীয় বিশ্বাসের নামে প্রাচীন গ্রীসের যুক্তিবোধ উপেক্ষিত হতে থাকে। শাসনের নামে চলতে থাকে গির্জার স্বেচ্ছাচার। রাজনীতি, শিল্প,সাহিত্য, সংস্কৃতি সবই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এ শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে মানুষ মুক্তির প্রতীক্ষা করতে থাকে। চর্তুদশ শতাব্দী থেকেই ধর্মীয় কুশাসনের বিরুদ্ধে জনমনে ক্ষোভ দানা বাধতে শুরু করে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে গির্জার ক্ষমতা সীমিত করার দাবী আসতে থাকে। তা'ছাড়া এ সময় মধ্যযুগীয় সামন্ত অর্থনীতির বিপরীতে নতুন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পদধ্বনি শুরু হয়। শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুক্ত ও উদার দৃষ্টিভংগির উদ্ভব ঘটে। এ প্রবণতাকেই 'ইউরোপীয় রেনেসাঁ' বলা হয়। এমতাবস্থায় রাজনৈতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে মুক্ত, উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ তথা ইহজাগতিক (Secular) দৃষ্টিভংগির প্রসার লাভ করতে থাকে। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে আধুনিক যুগের সূচনা রচিত হয়। নিকোলো ম্যাকিয়াভেলীর রাষ্ট্রচিন্তার মাধ্যমে আধুনিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগির সূত্রপাত ঘটে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- ❑ *পাঠ-১ : ইউরোপীয় রেনেসাঁ: রাষ্ট্রচিন্তায় রেনেসার প্রভাব;*
- ❑ *পাঠ-২ : নিকোলা ম্যাকিয়াভেলী;*
- ❑ *পাঠ-৩ : সংস্কার আন্দোলন: মার্টিনলুথা;*
- ❑ *পাঠ-৪: টমাস হব্‌স্‌;*
- ❑ *পাঠ-৫: জন লক;*
- ❑ *পাঠ-৬: জাঁ জ্যাক রুশো;*
- ❑ *পাঠ-৭: ফ্রেডারিক;*
- ❑ *পাঠ-৮: টমাস হীল গ্রীন*
- ❑ *পাঠ-৯: রাষ্ট্রদর্শনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ: অগাষ্ট কোঁতে ও*
- ❑ *পাঠ-১০: হার্বাট স্পেনসার।*

পাঠ - ১

ইউরোপীয় রেনেসাঁ : রাষ্ট্রচিন্তায় রেনেসাঁর প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রেনেসাঁ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- রেনেসাঁর রাজনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবেন।

মধ্যযুগীয় অবস্থা থেকে আধুনিক ইউরোপের অভ্যুদয়ের পেছনে রেনেসাঁর প্রভাব অপরিসীম। রেনেসাঁর কালপর্বকে চিহ্নিত করা হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ কয়েক দশক থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক পর্যন্ত বিস্তৃত সময়কে। ১৪৫৩ সালে তূর্কীদের হাতে কনস্টান্টিনোপল ও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর অনেক পন্ডিত পশ্চিম ইউরোপে পাড়ি জমান এবং সেখানকার চলমান প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবনের ধারায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে ইটালীকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয় এই আন্দোলন। যা পরবর্তীতে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, স্পেনসহ ইউরোপের অপরাপর দেশেও বিস্তৃত হয়। অবশ্য, ১৮৩৫ সালের পূর্বে 'রেনেসাঁ' শব্দটিকে ব্যাপকতর আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করে ব্যবহার করতে দেখা যায় না। আভিধানিক অর্থে রেনেসাঁর অর্থ হল নব জাগরণ বা প্রাচীন বিশেষত: গ্রীসীয় যুক্তিবাদের ও বিদ্যাচর্চার পুনর্জন্ম। অভিধানে রেনেসাঁর এই অর্থ দেয়া হলেও একে কেবল পুনর্জন্ম বলে ধরে নেয়া যায় না। ব্যাপক ও গভীর অর্থে রেনেসাঁ বলতে বুঝায় পুরনোকে ভিত্তি করে নব নির্মাণ বা নতুন সৃষ্টি। কেবল অতীতে প্রত্যাবর্তনের নাম যেমন রেনেসাঁ নয়; আবার অতীতকে পুরোপুরিভাবে বর্জনের কর্মসূচীও রেনেসাঁয় নেই। অতীতের যা কিছু কল্যাণকর ও স্থায়ী তা-ই রেনেসাঁর বিষয়বস্তু। সে দিক থেকে রেনেসাঁ বলতে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা সম্পর্কে চর্চার এক অদম্য উৎসাহকে বুঝায়। অতীতের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে বর্তমানের অভিজ্ঞতার আলোকে রেনেসাঁ ভবিষ্যৎকে ধারণ করে।

রেনেসাঁ একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের নাম। মনের মুক্তি তথা চিন্তার স্বাধীনতা অর্জিত হয় রেনেসাঁর মাধ্যমে। মানুষের মধ্যে এক নতুন, স্বাধীন, সাহসী চেতনা ও অনুসন্ধিৎসার মনোবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে রেনেসাঁ। এটি মানুষের চিন্তারাজ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। জাতীয় মানসলোকে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সংঘটিত হয় এই রেনেসাঁর মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, ইউরোপীয় রেনেসাঁর মূলে আরবীয় মুসলমানদের প্রচুর অবদান ছিল। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ ইউরোপীয়রা মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে গ্রীক-ল্যাটিন ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারা ও উন্নত মুসলিম সভ্যতার পরিচয় লাভ করে। এ পরিচয়ের ফলে ইউরোপে রেনেসাঁর উন্মেষ ঘটে। ঐতিহাসিক টয়নবি যথার্থই বলেছেন, 'ক্রুসেড বা ধর্ম যুদ্ধের ফলেই আধুনিক ইউরোপ জন্মলাভ করেছে।' (Modern Europe was born out of the sprit of the Crusade)

এক অর্থে রেনেসাঁ একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এই আন্দোলন জীবন, স্বাধীনতা, রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি সম্পর্কে মানুষের মধ্যযুগীয় ধর্মভিত্তিক ধারণাকে পুরোপুরিভাবে পাল্টে ফেলে। রেনেসাঁর মাধ্যমে সংঘটিত পরিবর্তন খন্ডিত বা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তার প্রতিফলন নয়; বরং এতে মানব সমাজের সামগ্রিক সর্বজনীনতা ফুটে উঠে। দেহের কোন একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভালো থাকা দিয়ে যেমন দৈহিক সুস্থতা বুঝায় না, তেমনি রেনেসাঁ বলতে একটি জাতির মানসিক ক্রিয়াকর্মের বিশেষ কোন দিক নয় বরং সার্বিক উৎকর্ষতা ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে বুঝায়। এখানে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সবকিছুই

অন্তর্ভূক্ত। রেনেসাঁকে তাই কেউ কেউ মননশীল সাংস্কৃতিক চেতনা আর তার বিচিত্র সম্প্রসারণের নামান্তর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

রেনেসাঁ আন্দোলনের ফলে সূচিত হয় বিজ্ঞানে নব নব আবিষ্কার। কম্পাস ও সমুদ্রপথ আবিষ্কারের ফলে আমেরিকাসহ (১৪৯২ সালে) নতুন নতুন ভূ-খন্ডের সন্ধান ঘটে এ পর্বে। গোলাবারুদের আবিষ্কার এ যুগের অপর একটি অসাধারণ ঘটনা যা বিশ্বব্যাপী ইউরোপীয় আধিপত্য স্থাপনে ও বিস্তারে সহায়তা করে। এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে ব্যাপক বাণিজ্যিক প্রসার ঘটে এ সময়। ছাপাখানা স্থাপনের প্রযুক্তিও আবিষ্কৃত হয় একই সময়ে। মোটকথা, রেনেসাঁ এমন একটি আন্দোলন হিসেবে সূচিত হয় যার ফলে মধ্যযুগীয় শৃঙ্খল থেকে ইউরোপীয় মনন আত্মনির্ভরশীল ও যুক্তিবাদী মনোভাব অর্জনের মাধ্যমে বিজ্ঞান মনস্কতা চিরতরে স্বাধীনতা লাভ করে। ব্রুনো, কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিও'র অসমাপ্ত সংগ্রাম রেনেসাঁর মাধ্যমে সফল পরিসমাপ্তি লাভ করে।

মধ্যযুগীয় পৃথিবীতে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা ও কর্ম ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হত। সমুদয় কর্তৃত্ব ছিল ঈশ্বরতান্ত্রিকভাবে সাজানো। কতকটা হিন্দু ধর্মের বর্ণ প্রথার মতোই বিন্যস্ত ছিল খ্রিস্টীয় সমাজ। সৌরজগতের গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতীক হিসেবে কৃষকদের তুলনা করা হত চাঁদের সাথে, ব্যবসায়ীদের বুধ গ্রহ, ধনিক গোষ্ঠীকে শুক্র, অভিজাতদের মঙ্গল, পুরনো অভিজাতদের শনি, রাজাকে বৃহস্পতি এবং গীর্জার পুরোহিতকে সূর্যের সাথে। এভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের সবকিছুতেই ছিল খ্রিস্টীয় যাজকতন্ত্রের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা। ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে পার্থিব ও পারমার্থিক নানা সুবিধাদি ভোগ করছিল যাজক শ্রেণী। রেনেসাঁ মানুষের মননশীলতাকে পরিশীলিত করে গীর্জার যাজকদের কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন থেকে মুক্ত করে। রেনেসাঁর কল্যাণে পুরোহিতদের যাজকীয় কর্তৃত্বকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষ স্বয়ং অধিষ্ঠিত হয় মর্যাদার আসনে। এতে করে চূড়ান্তড়ভাবে যাজকদের 'ঈশ্বরের দোহাই' মানুষের ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা ও যুক্তির দ্বারা স্থানান্তরিত হয়।

এভাবে ইতালীতে গড়ে উঠা নব জাগরণের আন্দোলন প্রবাহ ক্রমশঃ সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। রেনেসাঁর দীক্ষায় দীক্ষিত ইউরোপবাসীরা এ সময় খ্রিস্টধর্মের মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে মানুষের আত্মশক্তিকে অবিষ্কারে সক্ষম হয়। ইউরোপীয় রেনেসাঁ কালক্রমে মনের ইতিহাসের সকল পর্বে যুগান্তকারী মাইল ফলক হিসেবে দেখা দেয়।

রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে রেনেসাঁর প্রথম শুভ সূচনা ঘটে ইতালীয় চিন্তাবিদ নিকোলো মেকিয়াভেলী (১৪৬৯ - ১৫২৯) এর নেতৃত্বে। নব জাগরণে উদ্বুদ্ধ মেকিয়াভেলী যাজকদের অতিন্দ্রীয় শক্তিতে বিশ্বাস করতেন না। তিনি ছিলেন রেনেসাঁ জাতক; রাজনৈতিক নবজাগরণের মূর্ত প্রতীক। তাঁর কাছে সাফল্যই ছিল মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি এবং তা যে-কোন উপায়েই অর্জিত হোক না কেন। তাঁর মতে, সাফল্য যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে প্রয়োজন প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস আর নির্মমভাবে তা অর্জনের উপায় নির্ধারণ। মধ্যযুগীয় পন্ডিতদের গীর্জাকেন্দ্রিক স্থান রাষ্ট্রচিন্তাকে অবমুক্ত করে মেকিয়াভেলী নতুন এক অভিনব কৌশল বিজ্ঞানের জন্ম দেন, যেখানে সাফল্যই শাসকের নৈতিকতার মাপকাঠি হিসেবে স্বীকৃত হয়। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে ধর্ম ও নৈতিকতার বন্ধন থেকে রাজনীতিকে পৃথকভাবে উপস্থাপন করেন মেকিয়াভেলী। যুগের চাহিদাকে পূরণ করতে গিয়ে মেকিয়াভেলী রাষ্ট্র চিন্তাকে প্যাপাসির কুসংস্কার ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত করে রাজনৈতিক বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করেন। বাস্তবে রাজনৈতিক জগৎ যেভাবে পরিচালিত হয়, তারই আলোকে রাজনীতির কৌশল বিশ্লেষণ করেন মেকিয়াভেলী।

সারকথা

একটি সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের নাম। আধুনিক ইউরোপের অভ্যুদয়ের পেছনে রেনেসাঁর গুরুত্ব অপরিসীম। রেনেসাঁ আন্দোলন কেবল যাজকতন্ত্রের হাত থেকে রাজনীতিকে মুক্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি। রেনেসাঁ ইউরোপের সমাজের সামন্ততান্ত্রিক ধারা অবসান ঘটিয়ে আধুনিক জাতি রাষ্ট্র গঠনের সোপান তৈরী করে। ইউরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁর প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। রেনেসাঁ আন্দোলন বলতে কি বুঝায়?
(ক) সংস্কারবাদী আন্দোলন;
(খ) বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন;
(গ) প্রাচীন ভাবধারার আন্দোলন;
(ঘ) সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

২। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের ফলেই আধুনিক ইউরোপের জন্মলাভ করেছে - উক্তিটি করেছেন।
(ক) টয়নবি;
(খ) কার্লাইল;
(গ) টলস্টয়;
(ঘ) হিট্টি।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। মধ্যযুগীয় অবস্থা থেকে ইউরোপে কিভাবে আধুনিক যুগের উদ্ভব ঘটে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তায় রেনেসাঁ আন্দোলনের প্রভাব বর্ণনা করুন।

সঠিক উত্তর

১। খ, ২। ক।

পাঠ-২

নিকোলো ম্যাকিয়াভেলী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নিকোলো ম্যাকিয়াভেলীর রাষ্ট্রচিন্তার মৌলিক বিষয় বর্ণনা করতে পারবেন;
- রাষ্ট্রচিন্তায় ম্যাকিয়াভেলীর অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার পুরোধা নিকোলো ম্যাকিয়াভেলী (১৪৬৯-১৫২৭) ইতালীর ফ্লোরেন্স নগরীর সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের এক পর্যায়ে তিনি তাঁর যুগান্তকারী পুস্তক *'দি প্রিন্স'* রচনা করেন। *'দি প্রিন্স'* পুস্তকে ম্যাকিয়াভেলীর রাষ্ট্রচিন্তার মূল বিষয়গুলো বিবৃত হয়েছে। রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর আরও পুস্তক রয়েছে, এর মধ্যে *'ডিসকোর্স' 'দি আর্ট অব ওয়ার'* অন্যতম। ম্যাকিয়াভেলীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা তৎকালীন ইতালীর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রেনেসাঁ বা নবজাগরণের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। **প্রথমত:** তৎকালীন অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত দুর্বল এবং খন্ডবিখন্ড ইতালীকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে ম্যাকিয়াভেলী একত্রিত করার ব্রত নিয়ে একটি শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থার অধীনে আনতে চেয়েছিলেন। **দ্বিতীয়ত:** রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সন্তান হিসাবে খ্যাত ম্যাকিয়াভেলী রাজনৈতিক বিষয়াদিকে ইহজাগতিক (Secular) চেতনার দ্বারা পরিচালিত করার মানসে তাকে মধ্যযুগীয় তথা ধর্মীয় ও নৈতিকতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

মানব প্রকৃতির সম্পর্কে ধারণা

জাতি রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ এবং কঠোর শাসনের স্বার্থে শাসক যে কোন 'কৌশল' অবলম্বন করতে পারবেন।

উপরি-উক্ত লক্ষ্যে ম্যাকিয়াভেলী যে রাজনৈতিক দর্শন উপস্থাপন করেছেন, তা তাঁর মানব প্রকৃতির ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের চরিত্র ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করতে গিয়ে ম্যাকিয়াভেলী বলেছেন, মানুষ স্বার্থপর , হীন মনোভাবাপন্ন, ইত্যাদি। মানুষ লোভী এবং ভীত প্রাণী। নিরাপত্তা ও উপকারের জন্য মানুষ সমাজ ও সরকার গঠন করে ও তার প্রতি আনুগত্য দেখায়। এমতাবস্থায় কঠোর শাসনের কোন বিকল্প নাই। কঠোর শাসনের কাছে ব্যক্তি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকে। জাতি রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ এবং কঠোর শাসনের স্বার্থে শাসক যে কোন 'কৌশল' অবলম্বন করতে পারবেন। ম্যাকিয়াভেলীকে তাই অনেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী না বলে রাজনৈতিক কুটনীতি বিশ্লেষক এবং 'কৌশল বিজ্ঞানী' বলে অভিহিত করতে চান।

ধর্ম ও নৈতিকতার সাথে রাজনীতির সম্পর্ক

তাঁর মতে রাজনীতির জন্য প্রয়োজন ধর্ম বা নীতিশাস্ত্র নয়, বরং এর জন্য প্রয়োজন শক্তি (Power)।

ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কে ম্যাকিয়াভেলীর ধারণা তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। বস্তুত: ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কীয় ধারণা তাঁকে মধ্যযুগ থেকে পৃথক করে আধুনিক যুগের পথ প্রদর্শকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। রাজনৈতিক লক্ষ্য-তথা রাষ্ট্রের ঐক্য, সংহতি ও রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার জন্য ম্যাকিয়াভেলী ধর্ম ও নৈতিকতাকে রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করার পরামর্শ দিয়েছেন। ম্যাকিয়াভেলী মনে করতেন, ধর্ম, নৈতিকতা, আদর্শ বা মূল্যবোধ ইত্যাদি শাসকের কাজকর্মের সামনে বাঁধা স্বরূপ, ফলে এ সকল বাধার কারণে শাসকের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন বিঘ্নিত হতে পারে। তাই তিনি এগুলোকে রাজনীতি থেকে আলাদা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে রাজনীতির জন্য প্রয়োজন ধর্ম বা নীতিশাস্ত্র নয়, বরং এর জন্য প্রয়োজন শক্তি (Power)। জনগণের নিরাপত্তা ও সম্পত্তি রক্ষা করা এবং রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতির জন্য শক্তির কোন বিকল্প নাই। তবে তিনি জনগণের জন্য

ধর্ম ও নৈতিকতাকে অস্বীকার করেন নি। তা'ছাড়া শাসক প্রয়োজনে ধর্মকে ব্যবহার করতে পারবেন, এমন কথাও তিনি বলেছেন। অনেকে নীতি ও ধর্মের প্রশ্নে তাঁর দ্বৈতমানকে (Double standard) সমালোচনা করে থাকেন।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও শাসকের প্রতি উপদেশ

প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তায় সৎ ও উন্নত নৈতিক জীবন নিশ্চিত করাকে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ম্যাকিয়াভেলীর লেখনীতে তা প্রত্যাখান করে ক্ষমতা অর্জন এবং শক্তিকে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও ভিত্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার পুরোটাই রাষ্ট্রের ক্ষমতা অর্জন, বৃদ্ধি ও সংরক্ষরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। বলাবাহুল্য, তিনি তাই শাসককে 'সিংহের ন্যায় শক্তিশালী ও শৃগালের ন্যায় ধুর্ত' হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। রাষ্ট্রের উপরোক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তিনি মনে করতেন, শাসক যে কোন পথ অবলম্বন করতে পারেন। ম্যাকিয়াভেলী অনুসৃত এ নীতিকে অনেকে 'ম্যাকিয়াভেলীবাদ' (Machiavellism) বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। এর অর্থ হলো, রাষ্ট্রের স্বার্থে প্রতারণা, কপটতা ও নিষ্ঠুরতার দ্বারা শাসিতের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করা এবং শাসন করা। তিনি বলতে চান এর মধ্যে অনৈতিক বা অধর্মের কিছু নাই। রাষ্ট্রের স্বার্থে রাজনীতির তথা শাসকের থাকবে পূর্ণ স্বাধীনতা।

শাসককে 'সিংহের ন্যায় শক্তিশালী ও শৃগালের ন্যায় ধুর্ত' হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ম্যাকিয়াভেলীর দর্শনে রাজতান্ত্রিক ধরনের শাসন ব্যবস্থাই অগ্রাধিকার পেয়েছে এবং সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার হাতেই তিনি ন্যাস্ত করতে চেয়েছেন। ইতালীর তৎকালীন দুর্দশার পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাকিয়াভেলীর এ ধরনের চিন্তাভাবনা হয়তো বাস্তবমুখী ছিল।

ম্যাকিয়াভেলীর রাষ্ট্রচিন্তার মূল্যায়ন

রাষ্ট্রতত্ত্ব বা রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে ম্যাকিয়াভেলী হয়তো প্লেটো, এরিস্টটলের মত বড় মাপের কেউ নন। তবে রাজনীতির কৌশল সম্পর্কে তিনি যে অবদান রেখে গিয়েছেন তা তাঁকে স্থায়ী মর্যাদা দিয়েছে। মধ্যযুগীয় ধর্মাচ্ছন্ন এবং প্রায় অস্তিত্ব বিলুপ্ত যুক্তি ভিত্তিক রাজনীতিকে ম্যাকিয়াভেলীই সর্বপ্রথম স্বার্থকভাবে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এখানেই। এ অবদান ম্যাকিয়াভেলীকে অদ্যাবধি অম্লান করে রেখেছে। মানব প্রকৃতি সম্পর্কে হতাশাব্যাঞ্জক মন্তব্য করলেও মানবতার স্বার্থে তিনি ইহজাগতিক (Secular) চেতনাকে এগিয়ে নিয়েছেন। রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে পরলৌকিক বা ধর্মীয় ধারণা থেকে আলাদা করে তিনি আধুনিক যুগের একজন নির্মাতা হিসাবে ইতিহাসে পাকাপোক্ত স্থান করে নিয়েছেন।

রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে পরলৌকিক বা ধর্মীয় ধারণা থেকে আলাদা করে তিনি আধুনিক যুগের একজন নির্মাতা হিসাবে ইতিহাসে পাকাপোক্ত স্থান করে নিয়েছেন।

ম্যাকিয়াভেলী আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের পথ প্রদর্শক। জাতীয় রাষ্ট্র বিকাশের ক্ষেত্রে ম্যাকিয়াভেলী একজন মূল স্থপতির ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর পূর্বে রাষ্ট্রকে এমন স্পষ্ট ও জোরালোভাবে কেউ তুলে ধরেন নি। খ্রিষ্টীয় সাম্রাজ্যের বিপরীতে জাতি রাষ্ট্রের জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করার যোগ্যতার কথা তার লেখনীতে উচ্চারিত হয়েছে। ভাষা, ধর্ম, প্রথা, ইতিহাস, ঐতিহ্য নির্ভর অভিন্ন মানব গোষ্ঠীর সমন্বয়ে আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের ধারণা তাঁরই অবদান। পরবর্তীতে ইউরোপে ও বিশ্বের অন্যান্য স্থানে একজাতি ও এক রাষ্ট্রের দ্রুত উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রচিন্তাবিদ হলওয়েল যথার্থই বলেছেন, 'ম্যাকিয়াভেলীর নিকট থেকে মাৎসিনি, গ্যারিভল্টি, ক্যাভুর প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ দেশপ্রেমের পথ নিয়েছিলেন।'

ম্যাকিয়াভেলী আধুনিক কূটনীতির জনক হিসাবেও পরিচিত। ছোট, বড়, শত্রু, মিত্র নানা ধরনের রাষ্ট্রের মধ্যে টিকে থাকার জন্য একটি রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাকিয়াভেলী কূটনীতির মূল সূত্রগুলো তাঁর বিভিন্ন লেখনীর দ্বারা তুলে ধরেছেন।

রাজনীতি থেকে ধর্ম ও নীতিবিজ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তিনি দারুনভাবে সমালোচিত হয়ে থাকেন। শাসককে শঠতা, মিথ্যাচার, ক্ষমতা ও শক্তি প্রদর্শন এবং যুদ্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিকাশের পরামর্শ দেওয়ার জন্য তিনি সমালোচিত হন।

উপসংহারে বলা যায়, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র শাসনে ম্যাকিয়াভেলীর অনুসৃত কলাকৌশলগুলো ভালো হোক বা মন্দ হোক আধুনিক জাতি রাষ্ট্রে তা প্রায় সর্বত্রই অনুসরণ করা হচ্ছে। তাই ম্যাকিয়াভেলীর চিন্তা-চেতনা আধুনিককালে জীবিত ও ক্রিয়াশীল। তাঁর এ অবদান রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অম্লান হয়ে আছে।

সারকথা

নিকোলো ম্যাকিয়াভেলী আধুনিক রাজনীতির জনক। ধর্মাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে রাজনীতিকে উদ্ধার করে ইহজাগতিক (Secular) ও সতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্বের দাবীদার ম্যাকিয়াভেলী। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল জনগণের নিরাপত্তার জন্য, জাতি রাষ্ট্রের স্বার্থে শাসক যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ধর্ম, নীতি বা মূল্যবোধ ইত্যাদি কোন বাঁধা নয়। শঠতা, মিথ্যাচার ধোকাবাজি, রাজনীতির জন্য, কোন অপরাধ নয়। এ ভাবে তিনি আধুনিক যুগের স্থপতির ভূমিকা পালন করেছেন। অবশ্য তার জন্য তিনি সমালোচিতও হয়ে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। রাষ্ট্রচিন্তাকে কয়টি যুগে ভাগ করা হয়?

(ক) দু'টি; (খ) তিনটি;
(গ) পাঁচটি; (ঘ) ছয়টি।

২। মানব প্রকৃতি সম্পর্কে ম্যাকিয়াভেলী কি ধারণা পোষণ করতেন?

(ক) মানুষ স্বাভাবই শান্তিপ্রিয় প্রাণী;
(খ) মানুষ স্বার্থপর, হীন মনোভাবাপন্ন এবং লোভী;
(গ) মানুষ স্বাভাবগতভাবেই আইন মান্য করে থাকে;
(ঘ) মানুষ পরস্পরের প্রতি সহানুভুতিশীল প্রাণী।

৩। শাসককে ম্যাকিয়াভেলী কি পরামর্শ দিয়েছেন?

(ক) কঠোরভাবে ধর্মীয় শাসন কায়েম করা;
(খ) ন্যায় ও নীতিকে সর্বদা সমুন্নত রাখা;
(গ) দয়া ও দাক্ষিণ্যের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করা;
(ঘ) কঠোর হাতে শক্তি ও শঠতার আশ্রয় নিয়ে শাসন করা।

সঠিক উত্তর ১। খ ২। খ ৩। ঘ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

(১) রেনেসাঁ কী?
(২) ম্যাকিয়াভেলীর সময় ইতালীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন ছিল?
(৩) জাতি রাষ্ট্র কী?
(৪) ধর্ম ও নৈতিকতা থেকে ম্যাকিয়াভেলী কিভাবে রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে মুক্ত করতে চেয়েছেন?
(৫) ম্যাকিয়াভেলীকে কেন আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের পথ প্রদর্শক বলা হয়?
(৬) শাসকের জন্য ম্যাকিয়াভেলীর উল্লেখযোগ্য উপদেশগুলো কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। আধুনিক রাজনীতিতে ম্যাকিয়াভেলীর অবদান পরীক্ষা করুন।

পাঠ - ৩

সংস্কার আন্দোলন : মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬ খ্রিঃ)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- মার্টিন লুথারের প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইউরোপীয় রেনেসাঁ, রাজনীতি এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে লুথারের সংস্কার আন্দোলনের যোগসূত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- লুথারের আন্দোলনের চরিত্র ও তাঁর দর্শন চেতনা বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- লুথারের ব্যক্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা, তাঁর চিন্তার মোড় পরিবর্তন এবং সে সবের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে এবং আধুনিক যুগের সূচনা পর্বে ইউরোপে যে রেনেসাঁ বা নবজাগরণ আন্দোলন দেখা দেয়, যে প্রক্রিয়ায় আরবী ভাষা ও মুসলিম বিশ্বের মাধ্যমে (মুসলিম দার্শনিক-বিজ্ঞানীদের কৃত অনুবাদ, ব্যাখ্যা, ভাষ্যের দ্বারা) প্রাশ্চাত্য তার অতীত গ্রীক-রোমান যুগের যুক্তিনির্ভরতা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে পুন: অনুসন্ধানকরত: নতুন পুঁজিবাদী জীবন, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির পরিমন্ডল গঠনে প্রয়াস পায়, সেই নব জাগরণ আন্দোলনের সহযাত্রী আন্দোলনের নাম প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে ক্যাথলিক খ্রিস্ট ধর্মের অচলায়তন ভাঙ্গার উদ্যোগ গৃহীত হয়। খ্রিস্টীয় চার্চ বা গীর্জা এবং পাদ্রী/যাজকতন্ত্র/পোপের সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব ও মীমাংসার প্রক্রিয়া চলে। মধ্যযুগীয় খ্রিস্টীয় আবদ্ধতার বাইরে বেরিয়ে ইউরোপ তথা পাশ্চাত্যে আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে।

এই প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার কিংবা রিফর্মেশন বা সংস্কার আন্দোলন ছিল খ্রিস্টীয় বিশ্বের ব্যাপার এবং এ আন্দোলনে কিছু কিছু ভিন্ন চিন্তা রেখে জন ক্যালভিন, ফিলিপ মেলাঙ্কটন, উলরিক যুয়িংলি, জন নক্স এ সব মনীষীরা জড়িত থাকলেও মূলত: মার্টিন লুথার ও জন ক্যালভিন এ ক্ষেত্রে সমধিক খ্যাত।

ব্যক্তি জীবন, বিশেষ প্রভাব ও রচনাবলী

জার্মানীর আইজলবেন নগরীতে ১৪৮৩ সালে মার্টিন লুথারের জন্ম। মার্টিন লুথার ইতালীয় নিকোলো ম্যাকিয়াভেলীর সমকালীন হওয়া সত্ত্বেও শেষোক্তের ন্যায় রেনেসাঁস দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত ছিলেন না। 'দি প্রিন্স', 'এমিলি'-র রচয়িতা ম্যাকিয়াভেলী যেখানে রাষ্ট্রকে খ্রিস্ট ধর্ম ও নৈতিকতা থেকে পুরোপুরি পৃথক করে ফেলেন, সেখানে মার্টিন লুথার খ্রিস্ট ধর্মানুরূপী হিসেবে ধর্মের কাজেই জীবন কাটান এবং খ্রিস্ট ধর্মের মধ্যযুগীয় জঙ্গমতা থেকে একে মুক্ত করার প্রয়াস চালান। লুথারের ধর্ম, রাজনীতি, রাষ্ট্র, সরকার সম্পর্কিত ধারণা পাওয়া যায় তাঁর "Freedom of the Christian Man", "An Open Letter to the Christian Nobility", "Temporal Authority: To What extent it should be obeyed" ইত্যাদি গ্রন্থ হতে।

রোমান চার্চের অচলায়তন

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাব তথাকার জাগতিক বৈষয়িক জীবনের সকল ক্ষেত্রে পড়লেও রোমান চার্চ যেন তার অচলায়তন নিয়েই দাঁড়িয়ে ছিল। রেনেসাঁস সাংস্কৃতিক আন্দোলন হওয়ায় তা ইউরোপের খ্রিস্টীয় জীবনে ছাপ রাখতে পারেনি। রোমান চার্চ পূর্ববৎ টিকে থাকে। "সিভিলাইজেশন ডিওরিং দি মিড্ল এইজেজ" ("Civilization During the Middle Ages") গ্রন্থে জি.বি. এ্যাডামস বলেন, মধ্যযুগেই যে সব অচলায়তন তৈরী করে রেখেছিলো খ্রিস্টীয়

চার্চ এখনও জীবনাদর্শ, সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার, মতবাদ সম্পর্কে সেই অপরিবর্তিত নীতিসমূহেই দাঁড়িয়ে থাকার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করে। গীর্জা আগের মতোই খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্যিক চিন্তার ধারক হিসেবে ইউরোপকে এক অখন্ড খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় এবং পোপকে ক্রিস্টেনডম বা খ্রিস্টরাজ্যের একজন নিয়ন্ত্রক হিসেবে দেখতে চায়। এ ধরনের চিন্তা-জঙ্গমতার কারণেই রোমান চার্চ প্রতিক্রিয়াশীল বিবেচিত হয় এবং ইউরোপে ক্যাথলিসিজম বিরোধী প্রোটেস্টান্ট রিফর্মেশন বা সংস্কার আন্দোলনের ফলে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়ে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্র এবং আধুনিক ইউরোপের আবির্ভাব দেখতে পায় সমগ্র পৃথিবী।

সংস্কার আন্দোলনের তাৎপর্য

গোড়াতে রাজনীতির সঙ্গে যোগ না থাকলেও এবং কেবল চার্চ বা গীর্জার সংস্কার ও খ্রিস্ট ধর্মতত্ত্বের পুন:বিশ্লেষণের আন্দোলন হলেও শেষাবধি মার্টিন লুথারের রিফর্মেশন মুভমেন্টের গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য স্বচ্ছ হয়। রেনেসাঁর ইউরোপে জাতীয় ভূখন্ড ও জাতীয় রাষ্ট্র এতদিন দুর্বল অবস্থানে থাকলেও এবার সংস্কার আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় তা শক্ত ভিত্তি গড়ে তোলে। একচ্ছত্র জাতীয় রাজতন্ত্র (এবসলিউট ন্যাশনাল মনার্কী) প্রতিষ্ঠা পায়। "পলিটিক্যাল থট ফ্রম গারসন টু গ্রোশিয়াস" গ্রন্থে জে.এন. ফিগীস বলেন, চার্চ ও খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের বৈপরিত্য ও বৈরিতার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে ইউরোপের রাজনীতি।

বিধাতার সঙ্গে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক

রোমান ক্যাথলিসিজমের বিপরীতে সৃষ্ট মার্টিন লুথারের প্রোটেস্টান্ট ধর্ম সংস্কার আন্দোলন বিধাতার সাথে ব্যক্তি মানুষের সরাসরি সম্পর্ককে স্বীকৃতি দেয়। এতে অনিবার্য মাধ্যম হিসেবে পোপের আবশ্যকতাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়। এতে করে ব্যক্তি বিশেষ স্বীয় বিবেক অনুসারে খ্রিস্টীয় রিলিজিয়াস স্ক্রীপচার্স বা ধর্মবাণীকে ব্যাখ্যা করার অধিকার অর্জন করে। এত কিছুর পরও ইউরোপের তৎকালীন রাষ্ট্র শাসকগণ খ্রিস্ট ধর্ম সম্পর্কিত সংস্কার আন্দোলনের ব্যাপারে নিস্পৃহা রয়ে যায়।

জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের সংযোগ

এ পর্যায়ে মার্টিন লুথার ইউরোপের জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের শাসকগণকে সংস্কার আন্দোলনে বিজড়িত করার মানসে কিছু কাজ করেন। কেন না এসব শাসকদের সক্রিয়তা ছাড়া সংস্কার আন্দোলন সাফল্যের দ্বারে পৌঁছাতে পারছিলো না। লুথার তাই এ ঘোষণা দেন যে, খ্রিস্টীয় চার্চের যে বিশাল ভূসম্পৃত্তি ও অন্যান্য সম্পদ পোপের অথবা গীর্জার কোনো কর্তৃপক্ষের হাতে রয়েছে, সেটা বৈধ নয়। চার্চের অধীনে থাকা এ সব সম্পদের আসল মালিকানা রাষ্ট্র শাসকগণের এবং সেসবের ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা আবশ্যক। লুথারের এই কৌশলের ফলে রাষ্ট্রের শাসকবর্গ এযাবৎ চার্চের আওতাধীন বিশাল সম্পদের দখল লাভের সম্ভাবনায় সংস্কার আন্দোলনকে সফল করতে এগিয়ে আসেন। এভাবে ইংল্যান্ড ও জার্মানীর রাজন্যবর্গ প্রোটেস্টান্ট সংস্কার আন্দোলনের পক্ষ নিয়ে জাতিভিত্তিক প্রোটেস্টান্ট চার্চ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রত্যক্ষ সহায়তা দেন। এবার নতুন এসব প্রোটেস্টান্ট গীর্জার প্রধান নিযুক্ত হন তারা নিজেরাই। এতে করে স্বভাবতই ইউরোপীয় জাতীয় রাষ্ট্রের শাসকদের কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, মর্যাদা বেড়ে যায়। যদিও ইউরোপের সকল ভূখন্ডে জাতীয় রাজতন্ত্রের ক্ষমতা বেড়ে যাওয়াটা যে সংস্কার আন্দোলনকে ভিত্তি রেখে সম্ভব হয়, সেটা বলা যাবে না। যেমন, ফ্রান্সে আর স্পেনে রাজার কর্তৃত্ব বাড়লেও চার্চ ক্যাথলিকদের দখলেই থেকে যায়। কিন্তু ক্যাথলিসিজম কিংবা প্রোটেস্টান্টিজম যাই হোক না কেন যেখানেই চার্চ ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব হয় সেখানেই জয়-পরাজয় নির্বিশেষে বাস্তবে রাষ্ট্রশাসকের ক্ষমতা বর্ধনই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। গভীর বিশ্লেষণে দেখা যায়, সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবেই এটা ঘটেছে।

ব্যক্তি বিবেকের জাগরণ

লুথারের খ্রিস্টধর্ম সংস্কার আন্দোলনের ফলে ইনডিভিজ্যুয়াল কনসিয়েন্স বা ব্যক্তি বিবেকের নামে পার্থিব ও রাষ্ট্রীয় যাবতীয় বিষয়ে ব্যক্তি নিজস্ব বিবেক অনুযায়ী স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার ও সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ পায়। সংস্কার আন্দোলনের সুগভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য এখানেই নিহিত। লুথার খ্রিস্টীয় ধর্মীয় জীবনে যে অধিকার ব্যক্তিকে প্রদান করেন, রাজনৈতিক জীবনে

এর ফলেই ব্যক্তি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কর্তৃত্বের বিপরীতে ব্যক্তি বিবেকের স্বাধীনতার দাবি উচ্চারিত হয়।

লুথারের বক্তব্য অনুযায়ী পুরো রোমান চার্চ কোনো ধর্ম বাণীর ব্যাখ্যায় কিছু বললেও তা যদি ব্যক্তির নিজস্ব বিবেকজাত ব্যাখ্যার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে ব্যক্তি তা মানতে বাধ্য নয়। এ ভাবে ব্যক্তির বিবেক সমর্থিত আইনই দৈব আইন এবং সেটাই সে মানবে। এ ব্যাপারে চার্চের মতের সঙ্গে ভিন্নতা থাকলেও কিছু করণীয় নেই। "এ হিস্টোরী অব পলিটিক্যাল থট" গ্রন্থে ফিলিস ডোয়েল বলেন, খ্রিস্টধর্মের বিশাল ও জটিল বিষয়সমূহে বিধাতার অনুমোদন প্রকৃত অর্থে কোন্‌টা, এ নিয়ে ব্যক্তি কথা বলার অধিকারী। ধর্মীয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতাও তার রয়েছে, যেমন রয়েছে ন্যায়বিচার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার। লুথার ও তাঁর সহযোগীরা মনে করতেন, ধর্ম ও ন্যায়বিচার পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ মার্টিন লুথারের রচনাসমূহ খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কিত হলেও এগুলোর গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল। খ্রিস্টধর্মের বাণীর স্বাধীন ব্যাখ্যা দান ও চার্চের ভিতরকার অন্যায়-অনাচার নিয়ে প্রশ্ন তোলার এবং সেসব অপসারণের যে অধিকার তিনি ব্যক্তি মানুষকে দেন সেটার ফলেই পরিশেষে ব্যক্তি সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়ার এবং এযাবৎকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক অন্যায়-অনাচার দূর করার অধিকারের ব্যাপারে সচেতনতা অর্জন করে। লুথার ধর্মের বিষয়ে শেষ কথা বলার অধিকার কেবল পোপ ও চার্চের পুরোহিতদের হাতে না রেখে তা মানুষের মাঝে প্রসারিত করেন। তাঁর মতে, সব মানুষই একেক জন পুরোহিত এবং আইন বিষয়ে নিশ্চিত কর্তৃত্বের ভিত্তিতে মতামত ব্যক্তকরণ ব্যক্তির অধিকারভুক্ত।

জার্মানীর কৃষক বিদ্রোহ ও নিষ্ক্রিয় আনুগত্যের তত্ত্ব

মার্টিন লুথারের সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে বিস্তৃত ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণা গ্রহণ করেই জার্মানীর কৃষক সমাজ সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনের উদ্দেশ্যে ১৫২৫ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জার্মানীর এই কৃষক বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ায় লুথার যে ভূমিকা নেন, তাতে করেই তাঁর চিন্তার পরস্পবিরোধিতা ধরা পড়ে। কৃষক বিদ্রোহের ফলে সৃষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখে আতঙ্কিত লুথার ইত:পূর্বে উচ্চারিত তাঁর সকল বিশ্বাস ও আদর্শের বিপরীতে গিয়ে ঘোষণা দেন যে, কৃষক বিদ্রোহ যুক্তিযুক্ত নয়। কৃষকদের কোনো অধিকার নেই সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে নেবার। আইনসঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় শাসকবর্গের প্রতি 'মৌল আনুগত্য' বা 'নিষ্ক্রিয় আনুগত্য' প্রদর্শনই কৃষকদের দায়িত্ব। এ ভাবে লুথার ব্যক্তির বিবেক ও স্বাধীনতার পক্ষ পরিত্যাগ করে রাষ্ট্র শাসকের পক্ষে চলে যান। তিনি এখন ঘোষণা দেন যে, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অন্যায়-অনাচার অপনোদনের অধিকার রাষ্ট্র শাসকের। ব্যক্তির এ ক্ষেত্রে করণীয় নেই। লুথারীয় দর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তা এ ভাবেই স্ববিরোধিতার স্বাক্ষর রাখে।

নিষ্ক্রিয় আনুগত্যের সংশোধন

পরবর্তীকালে জার্মানীর প্রোটেস্টান্ট রাজা ও সম্রাটের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়ে লুথার তাঁর 'নিষ্ক্রিয় আনুগত্য' নীতির পুন:সংশোধন করেন। এবার লুথারকে বলতে হয় যে, নিষ্ক্রিয় আনুগত্যের নীতি যদিও প্রত্যেক খ্রিস্টানের পক্ষে অবশ্য পালনীয়, তবুও তাদের আত্মরক্ষার প্রশ্ন উঠলে কিংবা রাজার শাসন স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়লে খ্রিস্ট অনুসারীদের অধিকার রয়েছে বিদ্রোহ করার। লুথার আরো ঘোষণা দেন, সম্রাট আইন অমান্য করলে তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনও বাধ্যতামূলক নয়। আসলে লুথার কড়া জার্মান জাতীয়তাবাদী হওয়ায় তাঁকে স্বভাবতই জার্মান রাজাদের পক্ষ নিতে হয়েছিল। তবে তাঁর এই নীতিই পরবর্তীকালে রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের জন্মদানে সহায়ক হয়।

প্রতিক্রিয়া ও রাষ্ট্রাধিকার

গোড়াতে লুথার ধর্মীয় বিষয়ে ব্যক্তি বিবেক ও স্বাধীনতার যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন, তার ফলে রাষ্ট্র কর্তৃত্ব দারুণভাবে ব্যহত হয়। এদিকে সংস্কার আন্দোলনের পরোক্ষ ফল হিসেবে যখন রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট ছাড়া বহুসংখ্যক গোঁড়া খ্রিস্টীয় ডিনোমিনেশন তৈরি হয়, বহু ফেরকা ও বিভক্তি দেখা দেয়, তখন আত্মহননে বিজড়িত খ্রিস্টীয় সমাজকে সুশৃঙ্খল করার জন্য নতুনভাবে রাষ্ট্র কর্তৃত্বের ক্ষমতা বৃদ্ধির মতবাদকে সামনে টেনে আনতে হয়। লুথার এবার বলেন যে, রাষ্ট্র সহিষ্ণুতার সীমা ঠিক করে দেবে এবং ধর্মদ্রোহ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করারও অধিকারী হবে।

মূল্যায়ন

মার্টিন লুথারের দর্শন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন এমন হতে পারে যে, তিনি মধ্যযুগীয় খ্রিস্টীয় চার্চের অচলায়তন ও গোঁড়ামী থেকে খ্রিস্ট সমাজকে মুক্ত করেন। চার্চের উপর রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য দিয়ে তিনি ষোল শতকের রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন। লুথার রাষ্ট্রের প্রতি যে দৈব পবিত্রতা আরোপ করেন, সেটাই পরবর্তীকালে জার্মান ভাববাদ বিশেষত: হেগেলের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত, "ওয়েস্টার্ন পলিটিক্যাল থিওরী" গ্রন্থে এল. সি. ম্যাকডোনাল্ড বলেন, লুথার ব্যক্তি বিবেক ও স্বাধীনতার উপর যে গুরুত্বারোপ করেন, তা হতেই পরবর্তীকালে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্ভব ঘটে।

সারকথা

রোমান ক্যাথলিসিজমের বিরুদ্ধে মার্টিন লুথারের প্রোটেস্টান্ট ধর্ম সংস্কার আন্দোলন মধ্যযুগীয় খ্রিস্টীয় চার্চের অচলায়তন ও গোঁড়ামী থেকে খ্রিস্ট সমাজকে মুক্ত করে। চার্চের উপর রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য দিয়ে তিনি ষোল শতকের রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন। লুথার রাষ্ট্রের প্রতি যে দৈব পবিত্রতা আরোপ করেন, সেটাই পরবর্তীকালে জার্মান ভাববাদ বিশেষতঃ হেগেলের মধ্যে প্রকাশিত হয়। ওদিকে লুথার ব্যক্তিবিবেক ও স্বাধীনতার উপর যে গুরুত্বারোপ করেন, তা হতেই পরবর্তীকালে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্ভব হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। Freedom of The Christian Man গ্রন্থের লেখক কে?

ক) অগাষ্ট কোঁতে; খ) মার্টিন লুথার;
গ) মাদুয়া মারসিলিও; ঘ) সেন্ট অগাস্টিন।

২। জার্মানীর কৃষক সমাজ ন্যায় বিচার অর্জনের জন্য কত সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করে?

ক) ১৬২৫; খ) ১২২৫;
গ) ১৫২৫; ঘ) ১৪২৫।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। সংস্কার আন্দোলন কি?
২। বিধাতার সঙ্গে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সম্পর্কের অর্থ কি?
৩। মার্টিন লুথার কেন ক্যাথলিক গীর্জাকে অস্বীকার করেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। মার্টিন লুথারের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তর: ১। খ, ২। ঘ।

পাঠ-৪

টমাস হব্‌স্

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- টমাস হব্‌সের রাজনৈতিক দর্শনের মূল বিষয়গুলোর বর্ণনা করতে পারবেন;
- রাষ্ট্রের উৎপত্তির সামাজিক চুক্তি মতবাদ ও চরম সার্বভৌমত্ববাদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

টমাস হব্‌স্ (১৫৮৮-১৬৭৯) ইংল্যান্ডের এক যাজক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ২০ বৎসর বয়সে মেধাবী হব্‌স্ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন এবং রাজ পরিবারের গৃহশিক্ষকের পদে যোগ দেন। ইংল্যান্ডে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর জীবনকাল অতিক্রান্ত করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে জন্য তিনি খ্যাত হয়ে আছেন সেই আলোড়ন সৃষ্টিকারী রচনা *লেভিয়েথান* (Leviathan) ১৬৫১ সালে প্রকাশিত হয়। লেভিয়াথানে তিনি চরম রাজতন্ত্রের প্রতি শর্তহীন সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তৎকালীন রাজনৈতিক পেক্ষাপটে তিনি চরম রাজতন্ত্রকে উপযুক্ত শাসন ব্যবস্থা মনে করেছিলেন এবং উক্ত পুস্তকে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু তাঁর এ লেখা তৎকালে পার্লামেন্টপন্থী, রাজতন্ত্রবাদী, গীর্জা কাউকেই খুশী করতে পারে নি। ফলে দেশে-বিদেশে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে তাঁকে দিন যাপন করতে হয়। হব্‌সের রাষ্ট্রীয় দর্শন সমসাময়িক ঘটনাবলীর দ্বারা অংশত প্রভাবিত বলে অনেকে মনে করে থাকেন। অবশ্য হবস নিজেও স্বীকার করেছেন যে, সমসাময়িক ঘটনার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হব্‌স্ তৎকালীন ইংল্যান্ডের সীমাহীন অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি অবলোকন করেছেন। হব্‌স্-এর জীবদ্দশায় ঐ সময়টি ছিল ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ এবং রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের যুগ। ১৬০৩ সালে এলিজাবেথ মারা যাবার পর থেকে ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লব পর্যন্ত ইংল্যান্ডের এই গৃহযুদ্ধ কমবেশী একটানা স্থায়ী ছিল। ফলে দেশ জুড়ে নৈরাজ্য, নিরাপত্তাহীনতা বিরজমান ছিল। ইতিহাসের এরূপ যুগসন্ধিক্ষণে হব্‌স্ আর্বিভূত হয়েছিলেন। অংশত রাজপরিবারের প্রতি দুর্বলতার কারণে এবং অংশত আত্ম উপলব্ধি থেকে তাঁর মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, রাজার হাতে বিপুল ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। আর এ জন্যই তিনি রাজার হাতে চরম সার্বভৌম ক্ষমতা তুলে দিতে চেয়েছেন। ব্রিটেনকে নৈরাজ্য, ও গৃহযুদ্ধাবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি প্রচার করলেন 'চরম সার্বভৌমতত্ত্বের।'

হব্‌স্‌ই প্রথম দার্শনিক যিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে 'বৈজ্ঞানিক নীতি'র উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

একজন বস্তুবাদী চিন্তাবিদ হিসাবে হব্‌স্‌ই প্রথম দার্শনিক যিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে 'বৈজ্ঞানিক নীতি'র উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। অধ্যাপক স্যাবাইনের মতে, তাঁর এ বৈজ্ঞানিক নীতি 'বস্তুবাদ' বলে অভিহিত। তাঁর মতে, যা কিছু অস্তিত্বশীল তাই বস্তু এবং পরিবর্তন মানে গতি। এই গতিতত্ত্বকে তিনি রাজনীতি বিশ্লেষণে প্রয়োগ করেছেন। গতি-নির্ভর দর্শনকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছেন, যথা: (ক) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌত ঘটনা, তথা-পদার্থবিদ্যা ও জ্যামিতি, (খ) ব্যক্তির জ্ঞান অনুভূতি বা চিন্তা-নির্ভর মনোবিদ্যা ও শরীরবিদ্যা এবং (গ) কৃত্রিম সংগঠন, তথা রাষ্ট্রীয় সংগঠন বা রাষ্ট্র। গতিতত্ত্বের সংগে তিনি জ্যামিতির আশ্রয়ে রাষ্ট্রদর্শনকে পাকাপোক্ত করেছেন। জ্যামিতির ধারা হলো, সহজ ও সরল থেকে ক্রমশ: জটিল রহস্যের দিকে ধাবিত হওয়া। হব্‌স্ এ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তিনি প্রথমে মনোবিদ্যার আলোকে মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন এবং তার উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রের কথা বলেছেন। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তর পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। হব্‌স্ মনে করতেন, মানুষের মানসিকতা বা মনস্তত্ত্বকে বাদ দিয়ে রাজনীতি বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

মানব প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক রাজ্য সম্পর্কে হব্স্-এর ধারণা

হব্স্ বিশ্বাস করতেন রাজনীতি বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই মানুষের আচরণ, আকাঙ্খা, পছন্দ, অপছন্দ ইত্যাদি জানা জরুরী। তিনি মনে করেন মানুষের প্রধানতম আকাঙ্খা হলো আত্মসংরক্ষণ। আত্মরক্ষার এই মনস্তাত্ত্বিক নীতি মানুষের সমস্ত আচরণের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। এ একই কারণে মানুষ অন্যের চেয়ে ক্ষমতাবান হতে চায়। ক্ষমতা অর্জনের বাসনা মানব প্রকৃতির এক উল্লেখযোগ্য দিক।

হব্স্ মনে করেছেন যে, অন্তত: দেহ ও মনের দিক থেকে মানুষ মোটামুটিভাবে সমান। মানুষের বিভিন্ন গুণাবলীকে একত্রিত করলে তাদের মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায় না। মানুষ প্রত্যেকেই ভাবে যে সে অন্যের চাইতে জ্ঞানী। অন্যদিকে সবাই মনে করে যে, তারা সকলে সম ক্ষমতা সম্পন্ন। এ মনোবৃত্তি থেকে সকলেই একই ভাবে সব কিছু পেতে চায়। ফলে বিরোধ, সংঘর্ষ এবং কলহ হয় নিত্যসংগী। আত্ম অহংকারী মনোভাব কার্যত: মানুষকে সংঘর্ষের দিকে নিয়ে যায়। এতে ঐক্য নষ্ট হয়, অনৈক্য ও নৈরাজ্য প্রধান্য পায়। ফলে কলহপ্রিয়তা স্বার্থাম্বেষী মনোবৃত্তি নিরাপত্তাহীনতাকে অনিবার্য করে তোলে। মানুষের জীবন ঘৃণ্য, নি:সঙ্গ ও পশুর মত হয়ে ওঠে। এ অসভ্য ও বর্বর জীবন ধারা রাষ্ট্রপূর্ব প্রকৃতির রাজ্যে ছিল বলে হব্স্ বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্র-এমনকি সুষ্ঠু সমাজ বিহীন এই প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ ছিল প্রত্যেকে প্রত্যেকের শত্রু। এখানে নীতি ছিল: জোর যার মুল্লুক তার। এখানে মানুষের জীবন ছিল নি:সঙ্গ, অসহায়, নোংরা, পাশবিক ও ক্ষণস্থায়ী।

আত্ম অহংকারী মনোভাব কার্যত: মানুষকে সংঘর্ষের দিকে নিয়ে যায়।

প্রকৃতির রাজ্যের এ অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে মানুষ মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। কিন্তু কেন? হব্স্ বলেন, এর উত্তর মানুষের মনোস্তত্ত্বের মধ্যে তথা তার প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আছে। তাঁর মতে মানুষের মনে দুটি পরস্পর-বিরোধী শক্তি বিরাজমান। একটি হলো আদিম কলহপ্রিয়তা বা স্বার্থপরতা এবং অন্যটি হলো যুক্তিবোধ (reason)। এ যুক্তিরোধই মানুষকে অসহনীয় প্রকৃতির রাজ্য ত্যাগ করে আত্মরক্ষার জন্য সভ্য সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সংগঠন গড়ে তুলতে প্ররোচিত করেছে। যুক্তির প্রয়োগ করে মানুষ বুঝতে পারলো যে নিরাপত্তা যদি তার মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে তবে রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমেই তা যথাযথভাবে নিশ্চিত হতে পারে। তিনি আরও বলেছেন, প্রকৃতির আইন মানুষের মনে যুক্তিবোধ জাগিয়ে তোলে। হব্স্ প্রাকৃতিক আইনকে যুক্তি ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতীক হিসেবে গণ্য করেছেন। আর এই চেতনাই শেষ পর্যন্ত মানুষকে রাষ্ট্র গঠনে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

যুক্তিরোধই মানুষকে অসহনীয় প্রকৃতির রাজ্য ত্যাগ করে আত্মরক্ষার জন্য সভ্য সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সংগঠন গড়ে তুলতে প্ররোচিত করেছে।

রাষ্ট্র সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট

টমাস হব্স্ ছিলেন রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তা। প্রকৃতির রাজ্যের অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার মানসে জনগণ নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পন্ন করলো। প্রকৃতির রাজ্যে তারা যেসব অধিকার ভোগ করত সেগুলো তারা হয় পরিত্যাগ অথবা হস্তান্তর করলো -এটিই হল চুক্তির মূল কথা। এ চুক্তির ফলে সৃষ্টি হল রাষ্ট্র। এর পর তারা নিজেকে শাসন করার অধিকার প্রদান করলো সরকারের হাতে। সমস্ত ইচ্ছা একটি অভিন্ন ইচ্ছায় রূপ নিল। এটিই হল মরণশীল ঈশ্বর বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ। জনগণ নিজেরা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করেছিল, সরকারী শক্তির কোন অংশগ্রহণ এতে ছিল না।

রাজতন্ত্রই চুক্তির লক্ষ্য বাস্তবায়নে সর্বাপেক্ষা উপযোগী ব্যবস্থা।

মানুষ যুক্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে রাষ্ট্র গঠন করলো। যুক্তি একা সুষ্ঠু সমাজ নিশ্চিত করতে পারে না। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে দমন করে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও তার সার্বভৌম ক্ষমতার আশু প্রয়োগ প্রয়োজন। ব্যাপক ক্ষমতাশালী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এ হলো সার্বভৌম যিনি কারো কাছে কৈফিয়ৎ দিবেন না। তিনি কারও অধীন নন। তাঁর ক্ষমতা চরম ও চূড়ান্ত। এ সার্বভৌম ক্ষমতাই আইন তৈরী করবে। এ শক্তি অবিভাজ্য। সার্বভৌম শক্তি যেহেতু চুক্তির অংশ নয়, সেহেতু চুক্তির শর্ত তিনি মানতে বাধ্য নন। তাকে অভিযুক্ত করা যাবে না। সার্বভৌম ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণের অর্থ হবে নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করা, যার ফলাফল হবে আবার অশান্তির প্রাকৃতিক রাজ্যে

ব্যাপক ক্ষমতাশালী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

প্রত্যাবর্তন। তিনি বলেছেন, সার্বভৌম ক্ষমতা বহুজন, কয়েকজন বা একজনের উপর ন্যাস্ত থাকতে পারে। তার মতে, একজন তথা রাজতন্ত্রই চুক্তির লক্ষ্য বাস্তবায়নে সর্বাপেক্ষা উপযোগী ব্যবস্থা। হয়তো তৎকালীন ইংল্যান্ডের অশান্ত রাজনৈতিক অবস্থা তাঁকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

হব্‌স্-এর রাষ্ট্রদর্শনের বিরুদ্ধে সমালোচনা

বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে হব্‌স্-এর রাষ্ট্রীয় দর্শন সমালোচিত হয়েছে। যেমন,

- নিরাপত্তা বিধান করাই রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য, এমন বক্তব্য অহেতুক বলে অনেকে মনে করেন। রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বহুবিধ। আদর্শ, নৈতিকতা ইত্যাদির জন্য মানুষ জীবন পর্যন্ত দান করতে পারে। তা'ছাড়া সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি বিধানও রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য।
- হব্‌স্ এর সামাজিক চুক্তি মতবাদকে অনেকে অযৌক্তিক বলতে চেয়েছেন। ইবনেষ্টাইন বলেন, প্রাকৃতিক আইন যদি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে তাহলে প্রাকৃতিক আইন প্রাকৃতিক রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলো কেন? এ প্রশ্নের উত্তর হব্‌স্ পরিস্কারভাবে নিতে পারেন নাই।
- তাঁর তত্ত্ব ইতিহাস নির্ভর নয়, বরং কাল্পনিক। ইতিহাসে এমন কোন প্রমাণ নাই যে, চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল। বাস্তবতা বিবর্জিত তাঁর এ তত্ত্ব কতটুকু গ্রহণযোগ্য সেটি ভেবে দেখবার বিষয়।
- হব্‌স্ এর দর্শনের মধ্যে প্রচুর অসংগতি তাঁকে সমালোচনার পাত্রে পরিণত করেছে। তিনি প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে একক কোন তত্ত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। কখনও তাকে উত্তম বলেছেন, আবার কখনও তাকে অধম বলেছেন।
- তিনি চরম সার্বভৌমত্বের কথা বলে এবং রাজতন্ত্রকে সমর্থন করে গণতন্ত্রকে অস্বীকার করেছেন। অথচ তার দর্শনের প্রভাব তৎকালীন ইংল্যান্ডে উল্টোভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। ইংল্যান্ডে ১৬৮৮ সালের বিপ্লবের ভেতর দিয়ে গণতন্ত্রের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল আর রাজতন্ত্র বাস্তবে হলো ক্ষমতাহীন।
- তিনি সরকার ও সমাজের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন নি। এতে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। তাই কারও কারও মতে তিনি সর্বাত্মকবাদী ধারার জন্ম দিয়েছেন। তবে সমালোচনা সত্ত্বেও টমাস হব্‌স্ রাষ্ট্রচিন্তায় এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন। তাঁর হাতেই জাতি রাষ্ট্রের উৎকৃর্ষ সাধিত হয়েছিল। তিনি ম্যকিয়াভেলীর চেয়েও আরও কঠোরভাবে গীর্জার আধিপত্য অস্বীকার করছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম তিনিই বস্তুবাদী এবং বৈজ্ঞানিক ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। এসব অবদান হব্‌স্‌কে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধুনিক রাষ্ট্র দার্শনিকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সারকথা

একজন বস্তুবাদী দার্শনিক হিসাবে টমাস হব্‌স্‌ই হচ্ছেন প্রথম দার্শনিক যিনি রাজনীতি বিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি রাজনীতির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যারও প্রণেতা। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন হব্‌স্। সপ্তদশ শতাব্দীর ইল্যান্ডের গৃহযুদ্ধকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হব্‌স্ মনে করেছিলেন, নিরাপত্তা, আত্মসংরক্ষণই হলো মানুষের মূল আকাংখা। এ জন্য তিনি রাজতন্ত্র ও চরম সার্বভৌমত্ত তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। হব্‌স্ এর সময়ে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল?
   ক) রাজতন্ত্রের অধীনে জনগণ সুষ্ঠ ও সুন্দর জীবন যাপন করতেন ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ছিল;
   খ) পার্লামেন্ট ছিল সর্বময় ক্ষমতার উৎস;
   গ) রাজা ও পার্লামেন্টের দ্বন্দ্ব একটি চরম গৃহযুদ্ধাবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল;
   ঘ) রাজা গীর্জার অধীনে থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন।

২। হব্‌স্ এর মূল পুস্তকের নাম কি?
   ক) *দি প্রিন্স;*   খ) *দি রিপাবলিক;*
   গ। *লেভিয়েথান*;   ঘ) *দি সোসাল কন্টাক্ট।*

৩। হব্‌সের মতে সবাভৌম শক্তির অবস্থান কোথায়?
   ক) জনগণের হাতে;   খ) রাজার বা শাসকের হাতে;
   গ) অভিজাতদের হাতে; ঘ) পার্লামেন্টের হাতে।

সঠিক উত্তর   ১। গ   ২। গ   ৩। গ

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন:**
   ১) হব্‌স্‌কে কেন বস্তুবাদী দার্শনিক বলা হয়?
   ২) হব্‌স্ এর সময়ে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল?
   ৩) হব্‌স্ কেন রাজতন্ত্রকে সমর্থন করেছিলেন?
   ৪) হব্‌স্ এর মতে মানব প্রকৃতির স্বরূপ কী?
   ৫) হব্‌স্ এর মতে প্রকৃতির রাজ্যের অবস্থা কেমন ছিল?
   ৬) প্রাকৃতিক আইনের ধরন কেমন?
   ৭) হব্‌স্ এর মতে কাদের মধ্যে 'চুক্তি' সম্পাদিত হয়েছিল?
   ৮) সার্বভৌম শক্তি কি চুক্তির অংশ ছিল?
   ৯) চরম সার্বভৌমতত্ত্ব কী?

৩। **রচনামূলক প্রশ্ন:**
১। টমাস হব্‌স্ এর রাষ্ট্রচিন্তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

পাঠ-৫

জন লক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জন লকের রাজনৈতিক দর্শনের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- জন লকের রাজনৈতিক দর্শনের প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

পার্লামেন্টারী ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবক্তা জন লক (১৬৩২-১৭০৪) ইংল্যান্ডে এক গোঁড়া পিউরিটান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৫৮ সালে তিনি প্রতিষ্ঠানিক লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। কিন্তু পরে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে পড়াশোনা করেন। চিকিৎসক হিসাবে কার্যরত থাকার এক পর্যায়ে তিনি লর্ড এ্যাশলের বন্ধুত্ব লাভ করেন। এ্যাশলের আনুকুল্যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে সমাসীন হন। কিন্তু তাঁর পৃষ্ঠপোষক লর্ড এ্যাশলের অবস্থান সরকারী মহলে দুর্বল হয়ে পড়লে লক নিজেও সরকারের বিরাগভাজন হন এবং হল্যান্ড পলায়ন করেন। ১৬৮৯ সালে-অর্থাৎ ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং 'কমিশনার অব আপীল' পদে নিযুক্তি লাভ করেন। এ ভাবে তিনি বাস্তব প্রশাসন ও নীতি নির্ধারণ বিষয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পান। ১৬৯০ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *'টু ট্রীটিজেস'* প্রকাশিত হয়। এ পুস্তকে পার্লামেন্টারী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি সমর্থনসহ তাঁর অন্যান্য রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটে।

তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রভাব লকের চিন্তাধারার উপর গভীর রেখাপাত করেছিল। লকের জীবনের প্রায় প্রথম দুই তৃতীয়াংশ জুড়েই ছিল ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধাবস্থা। রাজা ও পার্লামেন্টের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জন লক পার্লামেন্টের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই ইংল্যান্ডের ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, ঘোষিত হয়েছিল ১৬৮৯ সালের 'অধিকার সনদ'। ইংল্যান্ডের এ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে লক উদারনীতিবাদকে মনে প্রাণে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তাই পার্লামেন্টারী ধরনের গণতন্ত্র এবং উদারনীতিবাদকে সামনে রেখেই লক তাঁর লেখনী ধরেছিলেন। তাঁর পদ্ধতি ছিল অভিজ্ঞানবাদী। কল্পনা, ধর্ম, আধ্যাতিকতা কোনটিই তাঁর লেখনী বা চিন্তায় স্থান পায় নি। অধ্যাপক স্যাবাইন লকের চিন্তাধারার এ বিশেষ দিকের প্রশংসা করেছেন।

মানুষের মধ্যে লোভ-লালসার প্রবৃত্তি থাকলেও চূড়ান্তভাবে যুক্তিবোধই কাজ করে থাকে।

হব্‌স্ এর মত লকও মানব চরিত্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু হব্‌স্ এর বিশ্লেষণ থেকে তাঁর বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ আলাদা। লকের মতে মানুষ যুক্তিবাদী প্রাণী। মানুষের মধ্যে লোভ লালসার প্রবৃত্তি থাকলেও চূড়ান্তভাবে যুক্তিবোধই কাজ করে থাকে। তাছাড়া মানুষের সাথে মানুষের পার্থক্য যতটা না প্রকৃতিগত তার চেয়েও বেশী হল কৃত্রিম। পরিবেশই মানুষকে ভালো বা মন্দ হতে শেখায় বলে লক মনে করতেন।

প্রকৃতির রাজ্য

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে লক হব্‌স্রের মত সামাজিক চুক্তি মতবাদে বিশ্বাস করতেন। তিনি প্রকৃতির রাজ্য সম্পর্কে তাঁর বইয়ে আলোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, হব্‌স্ও প্রকৃতির রাজ্যের বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু লকের বিবরণ হব্‌স্ এর বিবরণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। লকের মতে প্রকৃতির রাজ্য ছিল "শান্তি, সহমর্মীতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রতিরক্ষার রাজ্য। এখানে শান্তি, সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ব বিরাজ করত, ছিল সাম্য ও স্বাধীনতা। কিন্তু এ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার রূপ নিতো না । কারণ, অধিক স্বাধীনতাভোগ করা, অন্যকে পদানত করা-ইত্যাদি কুটবুদ্ধি মানুষের মধ্যে ছিল না। মানুষ বিবেচনা ও যুক্তিবোধ দিয়ে সব সময়ে কাজ

করতো। হব্‌স্ এর বর্ণনার মত প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের জীবন ঘৃণ্য, জঘন্য ও পাশাবিক ছিল না বলে লক মনে করতেন। লকের প্রকৃতির রাজ্যের এই অবস্থাকে অধ্যাপক ডানিং মূল্যায়ন করেছেন এ ভাবে যে, এখানে প্রাগ রাজনৈতিক অবস্থা (Pre-political) বিরাজমান ছিল না। কিন্তু এটি প্রাগ সামাজিক (Pre-social) ছিল। অর্থাৎ এটি হয়তো সামাজিক ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক ছিল না। আর লকের মতে এ কারণেই কালক্রমে মানুষের জীবনে নানা ধরনের অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ফলে মানুষ রাজনৈতিক ভাবে একটি সংগঠনের কথা চিন্তা করতে থাকে।

প্রকৃতির আইন

লকের মতে প্রকৃতির আইনের বলেই মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে সুখে শান্তিতে থাকতে পারতো। প্রকৃতির আইন ছিল মানুষের যুক্তিবোধের ফসল। সাম্য, স্বাধীনতা, ভাতৃত্ববোধ ইত্যাদি ছিল এ আইনের বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির আইন কার্যকর থাকার কারণেই তারা একে অপরের জীবন, সম্পত্তি ও স্বাতন্ত্রের উপর হস্তক্ষেপ করতো না। তবে প্রকৃতির রাজ্যে আইনের ব্যাখ্যা দান এবং তা বাস্তবায়নের কোন সাধারণ কর্তৃপক্ষ না থাকায় কেউ আইন ভংগ করলে শাস্তি দানের ব্যবস্থা ছিল না। মূল অসুবিধা ছিল এখানেই। আর এ সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষ চুক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক সংগঠন তথা রাষ্ট্র গঠনের দিকে এগিয়ে যায়।

সামাজিক চুক্তি

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, লকের মতে একটি কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন বোধের মধ্যেই চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র তৈরীর কারণ নিহিত। তাহলে বলা যায়, চুক্তির মাধ্যমে গঠিত সমাজ তৈরী হলো প্রকৃতির রাজ্যের মধ্যে চলমান সমস্যা ও অসুবিধাগুলো দূরীভূত করার জন্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মানুষের 'অধিকার' ও 'স্বাধীনতা'কে অক্ষুন্ন রাখা। কারণ কর্তৃপক্ষ সৃষ্টির ফলে মানুষ যদি দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তাহলে সে কর্তৃপক্ষ নিরর্থক হয়ে যায়। সুতরাং মানুষ চুক্তির মাধ্যমে এমন কোন স্বৈরাচারী শাসক তৈরী করলো না যে কর্তৃপক্ষ তাদের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে পারবে। প্রকৃতির রাজ্যের সবকিছু ত্যাগ করার জন্য মানুষ চুক্তি করে নাই। শুধুমাত্র প্রকৃতির রাজ্যের অবাধ ও ক্ষতিকর স্বাধীনতা ব্যতীত সকল কিছুই মানুষের এখতিয়ারে থাকলো। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন ছিল তার জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা। বলা বাহুল্য, প্রকৃতির রাজ্যে এক পর্যায়ে তা রক্ষিত হতো না, ফলে চুক্তি সংগঠিত হলো প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে, তারা কেউই আর অন্যকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা ব্যক্তিগতভাবে প্রয়োগ করতে পারবে না। এ ক্ষমতা একটি কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করা হলো। এ কর্তৃপক্ষের সৃষ্টিকর্তা হল জনগণ। কি কি নিয়মে কর্তৃপক্ষ কাজ করবে সেটাও জনগণ স্থির করে দেবে। তাই শাসক অবাধ ক্ষমতার মালিক নয়। মূল ক্ষমতা জনগণের হাতেই থেকে গেল। এখানেই লকের চুক্তির মূল বক্তব্য নিহিত। তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিক হব্‌স্ কিন্তু সে ক্ষমতা জনগণের কাছ থেকে নিয়ে শাসকের হাতে সর্বোতভাবে তুলে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। তাই লকের সামাজিক চুক্তি সীমিত চুক্তি। এক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা চূড়ান্ত নয়। সরকার একটি জিম্মাদারী প্রতিষ্ঠান মাত্র। চুক্তি একতরফা নয়।

মানুষের মৌলিক প্রয়োজন ছিল তার জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা।

জনগণের সাথে শাসক চুক্তিবদ্ধ। জনগণের জীবন স্বাধীনতা রক্ষায় শাসক অংগীকারাবদ্ধ। শাসক এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে জনগণের অধিকার থাকবে শাসক পরিবর্তন করার। সে ক্ষমতা ও অধিকার জনগণের কাছেই সংরক্ষিত। সুতরাং শাসক সার্বভৌম নয়। সার্বভৌম হল জনগণ। লকের চুক্তির অন্য একটি দিক আছে, তা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। জনগণ বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকেই বুঝানো হয়েছে। লকের চিন্তার মূল সুর হলো জনগণের সম্মতি (consent)। জনগণের সম্মতির উপর আইন, সরকার ও শাসন নির্ভরশীল। সরকার শুধু নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। নীতি নির্ধারণ করবে জনগণ। এভাবে লক তার সামাজিক চুক্তি মতবাদের মাধ্যমে 'গণসার্বভৌমত্ব' (Popular sovereignty) এবং পার্লমেন্টারী ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুরোধা হিসাবে রাজনীতি বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

লকের চিন্তার মূল সুর হলো জনগণের সম্মতি (consent)। জনগণের সম্মতির উপর আইন, সরকার ও শাসন নির্ভরশীল।

লকের সম্পত্তি তত্ত্ব

প্রকৃতিদত্ত জিনিসের উপর শ্রম যুক্ত হয়েই সম্পত্তি সৃষ্টি হয়।

লকের রাজনৈতিক দর্শনে সম্পত্তি তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে যুক্তিসংগত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সম্পত্তি তত্ত্ব বিচ্ছিন্ন কোন তত্ত্ব নয়। এটি লকের রাষ্ট্রদর্শনের কাঠামোর সংগে সংযুক্ত। লক বিশ্বাস করতেন, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের সম্পত্তির সুষ্ঠু নিশ্চয়তা ছিল না বলেই মানুষ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। সুতরাং জনগণের সম্পত্তি রক্ষা করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। লক মনে করতেন যে, শ্রমই সম্পত্তির মালিকানার বৈধ উৎস। সম্পত্তির প্রাথমিক উৎস হলো প্রকৃতি। তবে প্রকৃতিদত্ত জিনিসের উপর শ্রম যুক্ত হয়েই সম্পত্তি সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ শ্রম ছাড়া সম্পত্তি সৃষ্টি হতে পারে না। সম্পত্তি সৃষ্টির সাথে শ্রম ঐ সম্পত্তির মূল্যও সৃষ্টি করে। কোন জিনিসের জন্য যতবেশি শ্রম লাগবে ঐ জিনিসের মূল্য ততবেশি সংযোজিত হবে। তাঁর এ তত্ত্ব পরবর্তীতে সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব গঠনে ভূমিকা রেখেছে। কার্ল মার্কস উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব গঠনে লকের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে করা যায় (পাঠ-৫ দ্রষ্টব্য)।

লক ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎস হিসাবে শ্রমকেই চিহ্নিত করেছেন। তিনি সম্পত্তির সীমা সম্পর্কে খুব স্পষ্ট করে কিছু না বললেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত সম্পত্তির মালিকানার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন উদ্বৃত্ত সম্পদের দাবীদার হওয়ার কোন যৌক্তিকতা নাই। এ উদ্বৃত্তের মালিক হবে অন্যান্যরা। কিন্তু মুদ্রা ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর ধণতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ নির্মানে উদ্বৃত্ত পুন:বিনিয়োগের সুযোগ এনে দেয় এবং লকের তত্ত্ব অসহায় অবস্থার মধ্যে পতিত হয়। সুতরাং লকের সম্পত্তি তত্ত্বে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের বক্তব্য থাকলেও প্রকারান্তরে তা ধণতান্ত্রিক সমাজ নির্মানের দিকে ধাবিত হয়। তবে তার সম্পত্তি তত্ত্বের ভেতর দিয়ে তিনি একজন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাবিদের আসন দখল করে নিয়েছেন।

লকের রাষ্ট্রদর্শনের মূল্যায়ন

লকের অবদান বিশ্লেষণ করলে আমরা নিম্নলিখিত দিকগুলো দেখতে পাই:

লক সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক ধরনের সরকার ব্যবস্থার জনক হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন।

প্রাকৃতিক অধিকার রক্ষার তত্ত্ব প্রদান করে লক মানুষের মর্যাদা ও অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তিনি ভাবতেন জীবনকে পরিপূর্ণ করতে হলে অধিকার থাকা অপরিহার্য। লক সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক ধরনের সরকার ব্যবস্থার জনক হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। সরকারের ভিত্তি এবং বৈধতা হচ্ছে জনগণের সম্মতি-একথা তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেছেন। তাঁর এ সংবিধানিক ও নিয়মতান্ত্রিকতাবাদ বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূলমন্ত্র হিসেবে স্বীকৃত। জনগণই সার্বভৌম। সরকার অফুরন্ত ক্ষমতার আঁধার নয়। কতকগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সীমাবদ্ধতার মধ্যে সরকারকে কাজ করতে হবে। অর্থাৎ সরকারকে তিনি সীমাবদ্ধ করেছেন এবং সরকারকে গণসার্বভৌমত্বের অধীনস্থ করে স্বৈরাচার প্রতিরোধের ভিত্তি রচনা করে গেছেন। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে তার তত্ত্বের প্রতিফলন দেখা যায়। জন লক গণতন্ত্র ও সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন পদ্ধতির মূল প্রবক্তা। ক্ষমতা পৃথকিকরণের ইংগিত তাঁর চিন্তায় ফুটে উঠেছে।

উদারনীতিবাদ, সহনশীলতার বানী প্রচার করে পাশ্চাত্য সভ্যতার নবযুগের দ্বার উম্মোচিত করেছেন জন লক। সম্পত্তি তত্ত্বের মাধ্যমে লক তৎকালীন সনাতনী চিন্তাভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের জয়গান উচ্চারণ করেছেন।

সারকথা

রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে জন লক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি গণতন্ত্র, উদারনীতিবাদ, সাংবিধানিক সরকার, জনগণের সার্বভৌমত্ব, সীমিত সরকারের ধারণা ইত্যাদির জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিশেষ করে পার্লামেন্টারী ধরনের সরকার ব্যবস্থা জন লকের কাছে পুরোপুরিভাবে ঋণী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। রাজা এবং পার্লামেন্টেপন্থীদের দ্বন্দ্বে জন লকের ভূমিকা ছিল।
ক) রাজার পক্ষে; খ) পার্লামেন্টপন্থীদের পক্ষে;
গ) সেনাবাহিনীর পক্ষে; ঘ) কারও পক্ষেই নয়।

২। লকের মতে প্রকৃতির রাজ্য কেমন ছিল?
ক) স্বার্থের হানাহানিতে লিপ্ত এবং বিভীষিকাময়;
খ) জবরদস্তিমূলক;
গ) শান্তি সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বে পরিপূর্ণ;
ঘ) রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুশাসিত।

৩। লকের মতে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক কে?
ক) জনগণ; খ) রাজা;
গ) জন প্রতিনিধি; ঘ) কতিপয় জ্ঞানীগুণী ও প্রজ্ঞাশালী ব্যক্তি।

সঠিক উত্তর - ১। খ, ২। গ, ৩। ক।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। লক কেন ইংল্যান্ড ত্যাগ করেছিলেন?
২। লকের মতে প্রকৃতির রাজ্য কেমন ছিল?
৩। লকের মতে মানুষ কেন চুক্তিবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র তৈরী করেছিল?
৪। লকের মতে কয়টি চুক্তি হয়েছিল?
৫। লকের মতে স্বার্বভৌম ক্ষমতার মালিক কে এবং কেন?
৬। লকের মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎপত্তি কিভাবে ঘটেছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। লককে কেন প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের জনক বলা হয়? আলোচনা করুন।

পাঠ-৬

জ্যঁ জ্যাক রুশো (Jean Jacques Rousseau)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- জ্যঁ জ্যাক রুশোর রাজনৈতিক দর্শনের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- রাজনৈতিক দর্শনে জ্যাঁ জ্যাক রুশোর অবদান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

রাজনৈতিক দর্শনের ইতিহাসে ফরাসী দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) এক উজ্জল নক্ষত্র। তিনি অতি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃ-মাতৃহীন ভবঘুরে রুশো শুধুমাত্র আপন প্রতিভাবলে রাষ্ট্রদর্শনে নিজের ঠাঁই করে নিতে সক্ষম হয়েছিলন। ফরাসী বিপ্লবের বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমি সৃষ্টিকারী অন্যতম চিন্তাবিদ এ দার্শনিক তাঁর সামজিক চুক্তি মতবাদের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। মানুষের মুক্ত ও স্বাধীন জীবনের জন্য সর্বদা আকাংখী রুশো বিজ্ঞান, শিল্প ও সভ্যতার বিকাশকে মানুষের স্বাধীন সত্তার বিরুদ্ধে 'শৃঙ্খল' বলে মনে করতেন। আর এ শৃঙ্খল থেকে মানুষের স্বাধীনতাকে মুক্ত করতে তিনি তাঁর লেখনী পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলোর মধ্যে *অসমতার উৎপত্তি (Discourse of the orgin of inequality)*, *রাজনৈতিক অর্থনীতি (Political Economy)*, *সামাজিক চুক্তি (The Social Contact)*, ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

রুশোর রাজনৈতিক দর্শন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি যুক্তিবাদের প্রতি গভীর বিতৃষ্ণা পোষণ করতেন। অনেকে একে যুক্তির বিরুদ্ধে রুশোর বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছেন। এ মনোভাবই ছিল তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার মূল উৎস ও উদ্দেশ্য। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের জ্ঞান -বিজ্ঞান, মেধা, বুদ্ধি প্রভৃতির উপর রুশোর কোন প্রকার আস্থা ছিল না। তিনি ভাবতেন এগুলো মানুষের জীবনের জন্য প্রতিবন্ধক। এগুলো মানুষকে অমানুষ করে তোলে বলে রুশো মনে করতেন। আর এর সমাধান হিসেবে তিনি প্রাকৃতিক রাজ্যে ফিরে যাওয়ার সুপারিশ করেছেন। তাই প্রাকৃতিক রাজ্য ও সামাজিক চুক্তি রুশোর দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণকারী রুশো নৈতিকতার প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেন।

যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণকারী রুশো নৈতিকতার প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেন। তিনি মনে করতেন মানুষের সুখী ও স্বাধীন জীবন যাপনের জন্য শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও নৈতিকতার বেশি প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সামাজিক চুক্তি মতবাদী দার্শনিক তথা হব্স্ এবং লক থেকে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। কারণ হব্স্ ও লকের মতে সমাজ জীবনে মৌলিক লক্ষ্য ছিল উপযোগ তথা শান্তি ও নিরাপত্তার উপযোগ। প্রকৃতির রাজ্যে এর অভাবই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল কারণ। অন্যদিকে রুশোর মতে সমাজ গঠনের একমাত্র লক্ষ্য হলো মানুষের নৈতিকতার পরিপূর্ণ বিকাশ। এ ক্ষেড়েত্র আমরা রুশোর চিন্তায় প্লেটোর পূর্ণাঙ্গ এবং এরিস্টটলের মনোভাবের আংশিক প্রকাশ দেখতে পাই।

প্রকৃতির রাজ্য

দার্শনিক রুশো তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদ্বয়- হব্স্ এবং লকের মত প্রকৃতির রাজ্যে বিশ্বাস করতেন। তবে তাঁর প্রকৃতির রাজ্যের প্রকৃতি উল্লিখিত দু'জন দার্শনিক থেকে ভিন্নতর। হব্স্রের ন্যায় তিনি প্রকৃতির রাজ্যের মানুষকে স্বার্থপর, কলহপ্রিয় ও আত্মকেন্দ্রিক মনে করেন নি। আবার লকের ন্যায় যুক্তিবাদী বলেও ভাবেন নি। রুশোর মতে স্বার্থপরতা ও কলহবিবাদ ইত্যাদি সমাজ স্থাপনের পর দৃষ্টিভূত হয়। ক্ষমতা লিপ্সা ও সম্পত্তি জড়ো হওয়ার ফলে মানুষের মধ্যে যুক্তিবোধ এবং স্বার্থপরতার জন্ম নেয়। সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধির ও তা সংরক্ষণের মানসে মানুষ অন্যের সাথে যুদ্ধ ও কলহে লিপ্ত হতে শুরু করে এমতাবস্থায় মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মালেও সর্বত্রই 'শৃঙ্খলিত' হতে থাকে। অথচ সিভিল রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বে মানুষের জীবন ছিল সহজ ও সরল। তাদের মধ্যে কোনরূপ অহংকার বোধ ছিল না। তারা ছিল ভীরু, সংঘর্ষ-বিমুখ এমন

কি এ অবস্থা ছিল নীতিপূর্বাবস্থা। ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার মত বুদ্ধিও মানুষের মধ্যে ছিল না।

সামাজিক চুক্তি

রুশো তাঁর *'দি সোসাল কন্ট্রাক্ট'* পুস্তকে রাষ্ট্রীয় সংস্থার গোড়াপত্তনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে সামাজিক চুক্তির ফলেই উক্ত সংগঠনের জন্ম হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো কেনো এবং কি ভাবে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল? এ চুক্তির ফলাফলই বা কি? রুশো বলেছেন যে, সময়ের পরিবর্তনের সাথে প্রকৃতির রাজ্যের অবস্থা বদলাতে থাকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে মানুষের সাম্য, স্বাধীনতা ও সুখ শান্তি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে থাকে। আত্মরক্ষার প্রতিপক্ষ শক্তি প্রবল হওয়ার ফলে ব্যক্তি এককভাবে সে শক্তিকে মোকাবিলা করতে পারছিল না। এমতাবস্থায় মানুষ বুঝতে পারলো যে, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের জোটবদ্ধ হতে হবে। কারণ তারা বুঝতে পারলো অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে নতুন কোন শক্তি তৈরী করা সম্ভব নয়। কেবল মাত্র বিরাজমান শক্তিগুলোকে একত্রিত করা যায়। এ বোধ থেকেই অনুষ্ঠিত হয় সামাজিক চুক্তি (Social contact)। কিন্তু জোটবদ্ধ হওয়ায় তারা কারো অধীনস্থ হল না। অতীতের ন্যায় তাদের স্বাধীনতা অব্যাহত থাকলো। এই সম্মিলিত জীবন ব্যবস্থা স্বাধীনতা হননকারী হয়ে উঠলো না। কারণ তিনি বলেন, এ অবস্থায় প্রত্যেকে সমবেতভাবে নিজ নিজ জীবন ও ক্ষমতা সাধারণ ইচ্ছার চূড়ান্ত পরিচালনার কাছে সপে দেয়। তবে যুথবদ্ধ জীবন-ব্যবস্থায় প্রত্যেকে সার্বিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে যা দিল তা আবার ফিরে পেল। যৌথ শক্তি ব্যক্তিগত শক্তির চেয়ে বেশি শক্তিশালী। তাই রাষ্ট্রীয় সংগঠন অবশ্যই অধিক ফলপ্রসু। এ কারণেই মানুষ বিনা দ্বিধায় রাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পন করলো।

প্রত্যেকে সমবেতভাবে নিজ নিজ জীবন ও ক্ষমতা সাধারণ ইচ্ছার চূড়ান্ত পরিচালনার কাছে সপে দেয়।

রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। তাঁর এ তত্ত্ব হব্‌স্ ও লক থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র। চুক্তির ফলেই রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছিল। এক্ষেত্রে তাঁরা সবাই একমত পোষণ করলেও চুক্তির ধরন ও চুক্তির উদ্ভব, ক্ষমতার ব্যবহার সম্পর্কে তাঁদের সকলের ধারণা একরূপ নয়। হবস্ জনগণকে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেছেন। রুশোর চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ জনগণ-সরকারের হাতে চরম ক্ষমতা দেয়নি বা সরকারের সমালোচনা করা অথবা বিদ্রোহ করার অধিকার থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেনি। রুশোর সামাজিক চুক্তি অনেকটা লকের অনুকরণে গড়া। উভয়েই জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস মনে করেছেন। উভয়েই বলেছেন জনগণ প্রয়োজনে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকারী। বলাবাহুল্য, জনপ্রিয় সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব রুশো লকের নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন। তবে উভয়ের তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। লক বুর্জেয়া বিকাশের ধারায় গণতান্ত্রিক চেতনা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। লকের সংখ্যাগরিষ্ঠের ধারণার চেয়ে রুশোর সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্ব পৃথক ইঙ্গিতবাহী। তা'ছাড়া রুশো লকের মত বিপ্লবের বাণী প্রচার করেননি। সরকারের উপর আস্থাহীন হলে জনগণ লকের মতে বিপ্লবের মাধ্যমে সরকারকে পরিবর্তন করতে পারবে। অন্যদিকে রুশোর জনগণ সদা সর্বদা সক্রিয়। সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষেত্রে লক শর্তারোপ করলেও রুশো কোন প্রকার শর্ত দেন নি। তাঁর মতে জনগণ কোন প্রকার শর্তের অধীন নন। তাঁরা যখন চাইবেন তখনই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। সুতরাং দৃশ্যত লকের চেয়ে রুশোর কাছে জনগণ আরও বেশী ক্ষমতাশালী ও স্বাধীন।

লকের চেয়ে রুশোর কাছে জনগণ আরও বেশী ক্ষমতাশালী ও স্বাধীন

রুশোর মতে, সামাজিক চুক্তির ফলে জনগণ লাভবান হয়। তিনি বলতে চান চুক্তির ফলে মানুষ পায় স্বাধীনতা ও বিষয় সম্পত্তির উপর পূর্ণ মালিকানা। সর্বোপরি জনগণ নৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে। নৈতিক স্বাধীনতাকে রুশো প্রকৃত স্বাধীনতা বলে মনে করতেন।

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে রুশোর ধারণা

রুশোর মতে সাধারণ ইচ্ছা এবং সার্বভৌমত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। রুশোর সার্বভৌমত্ব জনগণ ব্যতীত অন্য কারও উপর ন্যস্ত নয়। তাঁর মতে ব্যক্তি, সংস্থা বা সরকার কখনও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। রুশোর সার্বভৌম তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়:

- রুশোর মতে সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর যোগ্য নয়। কারণ সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর যোগ্য হলে যারা এ ক্ষমতার মালিক অর্থাৎ জনগণ সার্বভৌমত্ব হারিয়ে ফেলবে। এ জন্য তিনি সার্বভৌমত্বকে হস্তান্তর যোগ্য করতে চান নি।
- রুশোর মতে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃতিই এমন যে তা কখনও ভুল করতে পারে না। অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব অভ্রান্ত প্রকৃতির, 'সার্বভৌম কখনও অন্যায় করতে পারে না।' কারণ সাধারণ ইচ্ছা সব সময়েই মানুষের সামগ্রীক কল্যাণমুখী।
- সার্বভৌম ক্ষমতা অভিভাজ্য। এ ক্ষমতাকে ভাগ করা যায় না। এখানে তিনি সার্বভৌম ক্ষমতাকে জীবদেহের সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ এর বিভক্তির অর্থ দাঁড়ায় একে শক্তিহীন করা। বলাবাহুল্য- এ ধারণার দ্বারা মন্টেস্কুর ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে।

সার্বভৌম ক্ষমতা চরম এবং চূড়ান্ত।

- সার্বভৌম ক্ষমতা চরম এবং চূড়ান্ত, সকলেই এর নির্দেশ মানতে বাধ্য। কোনটি ব্যক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও মঙ্গলময় তা কেবল সার্বভৌম শক্তিই বিচার করবে। সাধারণ ইচ্ছার নির্দেশ সকলেই মেনে চলতে বাধ্য। এ চরম ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না।
- তবে রুশো সার্বভৌম ক্ষমতার কতিপয় সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন। সার্বভৌম ক্ষমতা কল্যাণ বিরোধী কোন নির্দেশ দিলে জনগণ তা মানতে বাধ্য হবে না। তা'ছাড়া সার্বভৌম ক্ষমতা সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি লংঘন করবে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে রুশোর সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি উপলব্ধি করা যায়। তার প্রণীত সার্বভৌমত্ব বিমূর্ত 'সাধারণ ইচ্ছা নির্ভর' এবং কিঞ্চিত স্ববিরোধপূর্ণ।

সাধারণ ইচ্ছা

সকলের ইচ্ছার মধ্যে যদি সাধারণ ও অভিন্ন স্বার্থ না থাকে এবং তা যদি বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে পরিচালিত হয় তবে সে ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছা হতে পারে না।

রুশোর রাজনৈতিক দর্শনে সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রুশোর সাধারণ ইচ্ছার ধারণাটি জটিল প্রকৃতির। এ তত্ত্বটি রুশোর চিন্তাধারাকে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলেছে। রুশোর মতে সাধারণ ইচ্ছা এবং সকলের বা অধিকাংশের ইচ্ছা এক নয়। সাধারণ ইচ্ছা হল রাষ্ট্রের সেই ইচ্ছা যা জনগণের কল্যাণের জন্য পরিচালিত হয়। তাই সকলের ইচ্ছা (Will of all) এবং সাধারণ ইচ্ছা (General will) এক নাও হতে পারে। সকলের ইচ্ছার মধ্যে যদি সাধারণ ও অভিন্ন স্বার্থ না থাকে এবং তা যদি বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে পরিচালিত হয় তবে সে ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছা হতে পারে না। সুতরাং কোন ইচ্ছাকে সাধারণ ইচ্ছা হতে হলে তাকে অবশ্যই মানুষের অভিন্ন স্বার্থে ও সামগ্রীক কল্যাণের মনোভাব ধারণ করতে হয়। সকলের ইচ্ছা অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা উপরোক্ত গুণ সম্পন্ন নাও হতে পারে। রুশোর মতে সাধারণ ইচ্ছা বৃহত্তর ব্যক্তিস্বার্থ বিদ্বেষী নয়। কার্যত: সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থের বশবর্তী হয়ে কাজ করলে তা ঐ ব্যক্তির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যায়। অন্যদিকে সাধারণ ইচ্ছায় বশবর্তী হয়ে কাজ করলে ঐ কাজ তার স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। তাই মানুষকে দিয়ে সাধারণ ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে কাজ করিয়ে নিতে হয় বস্তুত তার নিজের ভালোর জন্যেই। এই অবস্থাকে রুশো 'যথার্থ স্বাধীন হতে বাধ্য করা' কে বুঝিয়েছেন (To force man to be free)।

রুশোর সাধারণ ইচ্ছা মতবাদ নানা দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে। তাঁর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বটি বিমূর্ত। এটি কি ভাবে বাস্তবে প্রয়োগ হতে পারে যে বিষয়ে স্পষ্ট কোন ধারণা তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। 'মানুষকে স্বাধীন করতে বাধ্য' করার অভিলাস স্বৈরশাসক ও স্বেচ্ছাচারিতা ও সর্বাত্মকবাদী ব্যবস্থার জন্ম দিতে পারে। তাই অনেকে মনে করেন রুশোর এ তত্ত্বটি অসংগতি ও স্ববিরোধিতাপূর্ণ।

রুশোর দর্শনের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

বিখ্যাত দার্শনিক টি, এইচ, গ্রীনের মতে রুশোর প্রভাব আমেরিকার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাকারীদের উপর পড়েছিল। তাছাড়া ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণাদাতাদের অন্যতম হিসেবে রুশোর নাম উচ্চস্বরে উচ্চারিত হয়ে থাকে। স্বাধীনতা সম্পর্কে রুশের ধারণা তুলনাহীন। রুশো প্রকৃতপক্ষে মানুষকে নৈতিক গুণসম্পন্ন ও দায়িত্বশীল করতে চেয়েছিলেন। সামগ্রীক কল্যাণই রাষ্ট্রের মূল

উদ্দেশ্য এ সত্যটি তিনি বার বার উচ্চারণ করতে চেয়েছেন। রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজ কর্মের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করার স্পৃহা রুশোকে প্রচলিত গণতন্ত্রপন্থী দার্শনিকদের চেয়েও এক ধাপ উপরে ঠাই করে দিয়েছে। তবে রুশোর বিরুদ্ধে স্ববিরোধিতার অভিযোগ পুরোপুরি খন্ডন করা যায় না। সাধারণ ইচ্ছার তত্ত্ব ও সার্বভৌমত্ত্বের ধারণাকে তিনি বাস্তবমুখী এবং সুস্পষ্ট করতে পারেন নি। সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও রুশোর অবদান মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্খার ইতিহাসে অনবদ্য।

সারকথা

সামাজিক চুক্তি মতবাদী ফরাসী দার্শনিক রুশো সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের বানীর জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। মানুষের স্বাধীনতাকে সত্যিকার ও পরিপূর্ণভাবে অর্থবহ করাই ছিল তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের মূল লক্ষ্য। সকল মানুষের স্বার্থে রাজনৈতিক সংগঠনকে পরিচালনার জন্য তিনি সাধারণ ইচ্ছা তত্ব প্রচার করেছেন। তবে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন স্ববিরোধী ও তা স্বৈরশাসকের জন্ম দিতে পারে বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। রুশোকে কোন্ বিপ্লবের অন্যতম স্থপতি মনে করা হয়?
- ক) আমেরিকান বিপ্লব; খ) ফরাসী বিপ্লব;
- গ) রুশ বিপ্লব; ঘ) চৈনিক বিপ্লব।

২। রুশোর মতে সাধারণ ইচ্ছা বলতে বোঝায়–
- ক) সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা; খ) সমগ্র মানুষের ইচ্ছা;
- গ) জ্ঞানী ও গুণী জনের ইচ্ছা; ঘ) জনগণের-তথা সকলের কল্যাণের ইচ্ছা।

৩। 'মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মায় কিন্তু সর্বত্রই যে 'শৃঙ্খলিত' রুশোর মতে এ 'শৃঙ্খলের' অর্থ কি?
- ক) দাম্পত্য শৃঙ্খল; খ) ধর্মের শৃঙ্খল;
- গ) পারিবারিক শৃঙ্খল; ঘ) সমাজ, সভ্যতা ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খল।

সঠিক উত্তর - ১। গ, ২। ঘ, ৩। ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন:

১। রুশোর উল্লেখযোগ্য পুস্তকগুলো কী?
২। সাধারণ ইচ্ছা বলতে রুশো কি ধরনের ইচ্ছাকে বুঝিয়েছেন?
৩। রুশোর মতে প্রাকৃতিক রাজ্য কেমন ছিল?
৪। রুশোর মতে সার্বভৌমের প্রকৃতি কেমন?
৫। রুশোর বিরুদ্ধে কি ধরনের সমালোচনা আছে?
৬। রুশো ও হব্‌স্‌র মধ্যে তুলনা করুন।
৭। রুশো ও লকের মধ্যে তুলনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বটি সামালোচনাসহ আলোচনা করুন

পাঠ - ৭

ফ্রেডারিক হেগেল (১৭৭০ - ১৮৩১ খ্রিঃ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- রাষ্ট্র সম্পর্কে হেগেলের পরম ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন;
- হেগেলের দ্বান্দ্বিক মতবাদ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় দার্শনিক জর্জ উইলহেল্‌ম ফ্রেডারিক হেগেল ১৭৭০ সালে জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নিজ শহর স্টাটগার্টে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় শিক্ষা সমাপনান্তে হেগেল ১৭৮৮ সালে টিউবিনজেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে পি এইচ ডি. ডিগ্রী এবং অত:পর ধর্মশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর রচনাবলীর প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় আগ্রহ। তাঁর পরিণত বয়েসের দিনগুলো কেটেছে হাইডেলবার্গ ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা পেশায়। যৌবনে হেগেল ফরাসী বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন এবং জার্মান রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশ নেন। ফরাসী বিপ্লবের ব্যর্থতা ও নেপোলিয়নের রাজনৈতিক উত্থানের ফলে হেগেলের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা দেয় দ্বৈততা। ইউরোপের বিপ্লবী পরিস্থিতি ও জার্মান বুর্জোয়াদের রক্ষণশীলতা এ দু'য়ের প্রভাবে দোদুল্যমানতা দেখা যায় হেগেলের চিন্তাধারায়।

যে সব গ্রন্থ হেগেলকে রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে অমর করে রেখেছে সেগুলোর মধ্যে 'দি ফিলসফি অব রাইট' (১৮২১ সাল) এবং 'দি ফিলসফি অব হিস্ট্রি' (১৮৩৭) অন্যতম। প্রথমোক্ত গ্রন্থে হেগেলের যুক্তি হল জড় জগতে প্রকৃতিই হচ্ছে জ্ঞান ও দর্শনের মূল লক্ষ্য। জ্ঞানের কাজ হল প্রকৃতির মাঝে যে 'শাশ্বত ঐকতান' ও 'সহজাত যুক্তিবাদিতা' লুকিয়ে আছে তা আবিষ্কার করা। পক্ষান্তরে, 'ফিলসফি অব হিস্ট্রি গ্রন্থে' তিনি রাষ্ট্রকে মানব জীবনের পরম সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক এবং যুক্তির চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। ব্যক্তিজীবনের নৈতিক মূল্য কেবল রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবেই অর্জন সম্ভব। রাষ্ট্রের মাধ্যমেই ব্যক্তির যথার্থ মুক্তি। হেগেলের ভাববাদী ধারণায় রাষ্ট্রের একটি স্বতন্ত্র্য ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয় ইচ্ছা রয়েছে এবং ব্যক্তির বা নাগরিকের খন্ড খন্ড ব্যক্তিত্ব ও ইচ্ছাসমূহ রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্ব বা ইচ্ছার মাধ্যমেই যথার্থতা অর্জন করে।

প্লেটো থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত যেসব চিন্তাবিদ গণতন্ত্রের বিরূপ সমালোচনা করেছেন, হেগেল তাঁদের অন্যতম। তাঁর মতে, নৈরাজ্যের পথে গণতন্ত্র হচ্ছে প্রথম সোপান। গণতন্ত্রকে তিনি 'বিবেকবুদ্ধি বর্জিত জনতার' শাসন বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর মতে, একটি সমাজে বিদ্যমান পরস্পরবিরোধী দাসিমূহের মাঝে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন গণতন্ত্রের পক্ষে দু:সাধ্য। এ জন্য প্রয়োজন অত্যন্ত শক্তিশালী রাজতন্ত্রের। তিনি মনে করেন গণতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ আলাপ ও ভোটাভুটির মাধ্যমে এ সব দ্বন্দ্বের সমাধা করা যায় না। এ জন্যে প্রয়োজন চরমতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্রের শক্তিশালী শাসন এবং এই শাসন হেগেলীয় ভাববাদের অপরিহার্য পরিণতি।

সংবিধান সম্পর্কে হেগেলের ধারণা ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি একে রাষ্ট্রের মৌলিক আইন হিসেবে স্বীকার করলেও তাঁর মতে 'কালের বিবর্তনে যদিও সংবিধান নির্দিষ্ট কোন পর্বে আবির্ভূত হয় তথাপি একে তৈরীকৃত কোন বিধান হিসেবে বিচেনা করা ঠিক নয়। বরং একে প্রণয়নকৃত বিষয়াদির উর্ধ্বে অবস্থিত এমন একটি গৌরবদীপ্ত স্থির ও ঐশ্বরিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক, পূর্বে থেকেই যার অস্তিত্ব বিদ্যমান।' হেগেলের মতে, রাষ্ট্র যেহেতু 'পৃথিবীর বুকে

ইশ্বরের জয়যাত্রা'র প্রতীক, সেহেতু রাষ্ট্রের সংবিধানের ক্ষেত্রে সাধারণ নশ্বর প্রাণীদের হস্তক্ষেপ অযাচিত।

হেগেল যুদ্ধকে বলিষ্ঠ জাতীয়াতাবাদের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন। তাঁর মতে স্থায়ী শান্তি তথাদীর্ঘ দিনযাবৎ শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজের ফলে জাতীয় জীবনে দুর্নীতি বাসা বাঁধে এবং জনগণ তাদের কর্মস্পৃহা হারিয়ে ফেলে, তাদের জীবন আবদ্ধ জলাসয়ের মত নিশ্চল ও স্থির হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, যুদ্ধের ফলে মানুষের কর্মক্ষমতা ও জাতিসমূহের শক্তি বৃদ্ধি ঘটে। যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের মাধ্যমে এক এক জাতি এক এক সময় জগৎ-সত্ত্বার প্রতিভূ হিসেবে আবির্ভূত হয়। তাঁর মতে, যুদ্ধই বিভিন্ন জাতির মাঝে সম্পর্ক নির্ধারণের স্বাভাবিক উপায়। উপরন্ত, পরস্পরবিরোধী জাতিসমূহের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে যুদ্ধ হল একমাত্র মাপকাঠি। হেগেলের যুদ্ধ সম্পর্কিত মতবাদ পরবর্তীতে হিটলারের রাজনৈতিক উত্থান ও জার্মানীর বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে অবদান রেখে থাকছে বলে অনেকে মনে করেন।

হেগেল প্রধানত: দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের উপর গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বিখ্যাত হয়ে আছেন। দর্শন শাস্ত্র সম্পর্কিত তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ফেনোমেনোলজি অব স্পিরিট' ১৮০৭ সালে এবং 'দি সায়েন্স অব লজিক' ১৮১৬ সালে প্রকাশিত হয়। হেগেলের দর্শনের একটি মৌলিক ধারণা হল জীবন একটি আধ্যাত্মিক তৎপরতার সমাহার। তিনি মনে করেন, ব্যক্তিজীবনের মতোই সৃষ্টির মূলেও একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া বিরাজমান। হেগেল এই পরিবর্তনশীল বিশ্ব প্রক্রিয়ার নামকরণ করেন 'পরম ধারণা' হিসেবে। হেগেলের কথায়, পরম ধারণার চেয়ে বাস্তব আই কিছু নেই। হেগেলের ধারণা প্রত্যয়টি প্লেটোর 'আইডিয়া বা ধারণার সমার্থক মনে করা হয়। হেগেল তাঁর 'ফেনোমেনোলজি অব্ স্পিরিট' গ্রন্থে পরম ধরণাকে এক পরম অস্তিত্ব হিসেবে ব্যাখ্যা করনে। তাঁর মতে, এ অস্তিত্বকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন অত্মচেতনার প্রক্রিয়া হিসেবে। এই প্রক্রিয়া পরিণতি লাভ করে পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে। যে মূহুর্তে কোন মানুষ জড় ও চেতনা এবং চিন্তা ও সত্ত্বার মধ্যেকার পার্থক্যর উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়, সেই মূহুর্তে সে পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞান অর্জন করে। হেগেলের মতে, একজন ব্যক্তি নিজেকে যা ভাবে, আসরে সে তাই। এখানে বিষয়ী এক ও অভিন্ন সত্ত্বায় মিশে যায়। চিন্তা ও স্বত্ত্বার ঐকান্তিকতার কল্যাণে যে অভিন্নতার সূত্রপাত, সে সম্পর্কে চেতনার দ্বারাই আত্মজ্ঞান তৈরী হয়।

বস্তু ও স্বত্ত্বার স্বরূপ, উৎপত্তি ও পরিণতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হেগেল সালে তাঁর দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির ব্যবহার করেন। হেগেলের পূর্বে কান্টের চিন্তায় এই পদ্ধতির আভাস পাওয়া যায় এবং ফিক্টে ও শেলিং দ্বান্দ্বিকতার ব্যবহার করেন। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির তিনটি পর্যায়কে চিহ্নিত করেন তিনি। প্রথম পর্যায়টিকে তিনি বলেন, বিমূর্ত প্রস্তাবনা (থিসিস)। এই বিমূর্ত প্রস্তাবনার মধ্যে সৃষ্টি হয় এক স্ববিরোধী প্রস্তাবনা (এন্টি থিসিস)। এই দু'টো পরস্পর বিরোধী প্রস্তাবনার সমন্বয়ে তৈরি হয় সমন্বিত প্রস্তাবনা বা সিনথিসিস। নতুন সমস্যা ও বিরোধের প্রেক্ষাপটে আবার নতুন ধারণার উন্মেষের সাথে সাথে শুরু হয় নতুন বিমূর্ত প্রস্তাবনা । এই বিরোধের সমন্বয় ঘটে পূর্বেকার চাইতে উচ্চতর সত্য প্রত্যয়ের মাধ্যমে। এ ভাবে যে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া রাস্তবস্বত্ত্বার বিবর্তনকে অনুসরণ করে তা এক পর্যায়ে সব বিরোধের সমাধানের মাধ্যমে পরম স্ববিরোধিতার শিকার হন। তথাপি, কার্ল মার্কস হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব, ইতিহাস-সচেতনতা ও যুক্তিতত্ত্বের সমালোচনা করেন। এঙ্গেলস বলেন যে, হেগেলের বস্তুবাদ ছিল যথার্থ, তাঁর পা ছিল শূন্যের দিকে, আমরা তাঁকে পায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে হাঁটতে সহায়তা করেছি মাত্র। এই সমালোচনা সত্ত্বেও হেগেলীয় দর্শনের সবচেয়ে' অকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এর যৌক্তিক পদ্ধতি ও সুনিশ্চিত সত্য অবিষ্কার এবং মানুষের জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় বিরোধ দূরীকরণ ও সমস্যার সমাধানে একাগ্রতা।

হেগেল রচিত অপরাপর গ্রন্থাদির মাঝে 'লেকচার্স অন দি ফিলসফি অব রিলিজিয়ন' এবং 'লেকচার্স অন এসথেটিকস্' শীর্ষক দুটো গ্রন্থ সুধী সমাজে সবিশেষ সমাদৃত। বিশেষত: প্রথমোক্ত গ্রন্থে স্রষ্টাকে হেগেল আইডিয়া বা ধারণা বলে অভিহিত করেন। হেগেলের মতে, সৃষ্টিজগৎ অনাদিকাল থেকে আছে। স্রষ্টা সৃষ্টি জগতের সজীব গতিশীল বুদ্ধি। তিনি নিজেকে জগতে, প্রকৃতিতে এবং ইতিহাসে প্রকাশ করে থাকেন। স্রষ্টা সৃষ্টিতে নিমজ্জিত নন, আবার

পাঠ - ৮

সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে দ্রবীভূত নয়। সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে স্রষ্টাকে কল্পনা করা যায় না। স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির কোন বাস্তব সত্ত্বা নেই। স্রষ্টা বলতে হেগেল আগে থেকে ... ম সত্ত্বাকে বোঝেন নি, উপলব্দি করেছেন এক বর্ধিঞ্চু স্রষ্টাকে যিনি বিবর্ত... মানুষের মনে পরিপূর্ণ আত্মসচেতনতা অর্জন করে থাকেন।

দর্শন ও ধর্মের ইতিহাস পাঠ ও অনুশীলনে হেগেলের প্রদত্ত দিকনির্দেশনার ফলে দর্শনের ইতিহাস বিশারদ এক দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। ইতিহাস দর্শন, আইন দর্শন, রাষ্ট্র দর্শন, প্রভৃতি মানবিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব ছিল খুবই ব্যাপক। ১৮২০ সাল থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত তাঁর দার্শনিক মতবাদ জার্মানীর অন্যতম প্রভাবশালী দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। হেগেলীয় দর্শনের প্রুশিয়ান রাষ্ট্রের সমর্থন ছিল এবং জার্মানীর প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ দর্শনের প্রভাব পড়ে।

সারকথা

জার্মান ক্লাসিক্যাল দাশিনিকদের অন্যতম পুরোধা হেগেল ছিলেন একাধারে বস্তুবাদী ও পরম সত্ত্বায় বিশ্বাসী। তিনি তাঁর দ্বন্দ্বতত্ত্বের ওপর পরম সত্ত্বাকে স্থাপন করতে গিয়ে স্ববিরোধিতার শিকারে পরিণত হন এবং সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদানে ব্যর্থ হন। তথাপি, তাঁর দ্বন্দ্বতত্ত্ব, ইতিহাস-সচেতনতা ও যুক্তিতত্ত্ব প্রশংসার দাবিদার। হেগেল ও মার্কসের দর্শনের মৌলিক পার্থক্য হল হেগেল তাঁর দর্শনে ভাবকে বস্তুর আগে স্থাপন করেন আর মার্কস ভাবের পুর্বে বস্তুকে । তবে মার্কস হেগেলের নিকট থেকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। হেগেল কোন্ ধরনের দার্শনিক ছিলেন?

ক) হেগেল একজন মার্কসবাদী দার্শনিক ছিলেন; খ) হেগেল একজন বস্তুবাদী দার্শনিক ছিলেন;

গ) হেগেল একজন ভাববাদী দার্শনিক ছিলেন; ঘ) হেগেল একজন প্রাচীন সমাজবিজ্ঞানী ছিলেন।

২। রাষ্ট্রকে হেগেল কিভাবে মূল্যায়ন করেছেন?

ক) রাষ্ট্র মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন; খ) রাষ্ট্র মানব জীবনের পরম সত্ত্বা;

গ) রাষ্ট্র ঐক্যবদ্ধ মানুষের যুক্তির অভিব্যক্তি; ঘ) রাষ্ট্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বাহন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। রাষ্ট্র সম্পর্কে হেগেলের ধারণা কী?

২। হেগেলের মতে পরম ধারণা কী?

৩। হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি কী?

৪। যুদ্ধকে হেগেল কিভাবে মূল্যায়ন করেছেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

হেগেলের দর্শনের প্রধান দিকগুলো আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তর : ১। গ, ২। খ

টমাস হীল গ্রীন (১৮৩৬-১৮৮২ খ্রি:)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গ্রীনের উপর নানাবিধ দর্শনের প্রভাব সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- গ্রীনের ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণা ও রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- রাষ্ট্র ও আইনের প্রতি মানুষের আনুগত্যের কারণ বিষয়ে গ্রীনের বিশ্লেষণ বুঝতে পারবেন;
- শক্তি নয়, ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি - গ্রীনের এ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে সক্ষম হবেন।

ভূমিকা

পাশ্চাত্যের উপযোগবাদী দার্শনিকবৃন্দ গণতন্ত্র, স্বাধীনতা আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পক্ষে ছিলেন। তবে তারা সফল হন নি ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককে যথার্থ প্রেক্ষাপটে দাঁড় করাতে। জেরেমী বেন্থাম সহ গোড়ার দিককার উপযোগবাদীরা নানা সমস্যার সমাধান প্রয়াসে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের আদর্শকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের বন্যায় তা ভেসে যায়। উপযোগবাদী আদর্শ ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে স্বাধীনতা ও সংস্কারের কেন্দ্রীয় ভিত্তিরূপে ক্রিয়াশীল থাকলেও পরবর্তীতে তা প্রতিক্রিয়াশীলতা ও বিশেষ সুবিধাবাদিতার স্মারক হয়ে উঠে। উপযোগবাদের অসফলতার প্রেক্ষাপটে সমস্যা সমাধানের নব পরিকল্পনা নিয়ে যে বুদ্ধিজীবী-দার্শনিকগণ সামনে চলে আসেন, ব্রিটেনের রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে তাঁরাই অক্সফোর্ড আইডিয়েলিস্ট বা অক্সফোর্ড আদর্শবাদী সম্প্রদায় বলে খ্যাত। গ্রীন, বোসাঙ্কে, রিচি ব্র্যাডলী, বার্কার, লিন্ডসে, ওয়ালেস এরা ছিলেন এই দলে।

ব্যক্তিজীবন

১৮৩৬ সালে ইংল্যান্ডের এক সাধারণ যাজক পরিবারে টমাস হীল গ্রীন জন্ম নেন। অক্সফোর্ডেই কাটে তাঁর সারাটা জীবন। ব্যালিয়ল কলেজে টিউটর পদ থেকে তিনি সেখানে হোয়াইট'স প্রফেসর অফ মর‍্যাল ফিলোসফি পদে পদোন্নতি পান। শিক্ষকতার বাইরে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে গ্রীনের বিচরণ ছিল। অক্সফোর্ড টাউন কাউন্সিল, অক্সফোর্ড স্কুল বোর্ড এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ক কমিটিতে তিনি সদস্য ছিলেন। এ ভাবে নৈতিক দর্শনের শিক্ষকতার পাশাপাশি জনজীবনে বিচরণ গ্রীনের চেতনায় মানব প্রকৃতির যথার্থ উপলব্ধি সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।

টমাস হীল গ্রীন ও তাঁর সহযোগিদের দর্শনকে ভাববাদ কিংবা আদর্শবাদ বলা হয়। তবে তা হেগেলের দর্শনের অনুরূপ নয়। গ্রীনের দর্শন বরং হেগেল অপেক্ষা ইমানুয়েল কান্টের কাছাকাছি। আধ্যাত্মিক দর্শনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ছেড়ে কেবল নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে এটা স্বীকার করতেই হবে। হেগেলের ন্যায় *thorough going statists* বা চরম রাষ্ট্রবাদী না হয়ে গ্রীন বরং কান্টের ন্যায় *semi statists* বা অর্ধরাষ্ট্রবাদী। কান্টের ভাববাদ তো বটেই, সেইকালের প্রাচীন গ্রীসীয় প্লেটো-এরিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তা, জ্যা জ্যাক রুশোর "সোশাল কন্ট্রাক্ট"-এর সাধারণ ইচ্ছা এবং ইংল্যান্ডের গোঁড়া খ্রিষ্টীয় ধর্মমত বিরোধী নন-কনফরমিস্ট রাজনৈতিক বিশ্বাস - এ সব প্রভাব রেখেছে গ্রীনের চিন্তায়।

ব্যক্তির স্বাধীনতা, নৈতিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ

আরো কয়েকটি রচনা থাকলেও ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত "দি প্রিন্সিপল্স অফ পলিটিক্যাল অবলিগেশন্স" নামক গ্রন্থটিই গ্রীনের চিন্তার ব্যাপক ও যথার্থ বহি:প্রকাশ ঘটায়। উদারতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ঐতিহ্য গ্রীনের চিন্তার ভিত্তি। গ্রীন বেন্থাম ও মিলের দার্শনিক চরমবাদ অথবা রুশো ও হেগেলের রাষ্ট্রীয় সর্বাত্মকবাদের কোনো চরমেই যান নি। মানুষের স্বাধীনতার প্রশ্নে গ্রীন এদের থেকে স্বতন্ত্র। উল্লিখিত উভয় চরমপন্থা পরিত্যাগ করার নিমিত্তে গ্রীন 'পজিটিভ' বা 'ইতিবাচক' স্বাধীনতার গভীরতর ভিত্তি সন্ধান করেন।

গ্রীন ব্যক্তি স্বাধীনতার নীতিকে সমর্থন করেছেন। অথচ তিনি চরম স্বাতন্ত্র্যবাদীদের ন্যায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন না। তাঁর স্বাধীনতার ধারণা নৈতিকতাপ্রসূত। কিন্তু সেটা মানুষের স্বাধীনতার স্বার্থেই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের আবশ্যকতাকে অনুভব করে। স্বাধীনতার সঙ্গে নৈতিক কল্যাণবোধের সম্পর্ক নেই - উপযোগবাদীদের এই ধারণাকে গ্রীন সমর্থন করেন নি। যা ইচ্ছা, যেমনটা ইচ্ছা করার স্বাধীনতা হলো স্বেচ্ছাচার। সেটা মানুষের স্বাধীনতা নয়। সকল রকম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বিবর্জিত অবস্থায় স্বাধীনতা নেই। এমন অবস্থায় স্বাধীনতার অনুসন্ধান স্বাধীনতার 'নেগেটিভ' বা 'নেতিবাচক' ধারণার স্মারক। বস্তুত: তা স্বাধীনতাহীনতা। গ্রীনের মতে, স্বাধীনতা একটা 'ইতিবাচক' প্রত্যয় ও প্রপঞ্চ। এর সঠিক উপস্থিতি রাষ্ট্রীয় যৌক্তিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমেই উপলব্ধ হতে পারে। ডাবি- উ. এস. ম্যাকগভার্ন তাঁর *"From Luther to Hitler"* গ্রন্থে যথার্থই বলেন, গ্রীনের দর্শনে মানবিক স্বাধীনতা যা খুশী করার সুযোগ নয়। প্রকৃত স্বাধীনতা মানুষের সৎ ইচ্ছা থেকে উত্থাপিত লক্ষ্যগুলো হাসিলের পথে দেখা দেয়া বাধা-বিপত্তি থেকে মুক্তির স্মারক। স্বাধীনতা হচ্ছে মানুষের যাবতীয় ক্ষমতার অবাধ প্রকাশ যার মাধ্যমে সে বা তারা মানবিক কল্যাণ নিশ্চিত করবে। গ্রীনের মতে, লন্ডন শহরের বস্তি এলাকার অশিক্ষিত ও পানাসক্ত লোকদের শিক্ষা গ্রহণ না করার কিংবা যেমন ইচ্ছা মদ-জুয়া, তাস-পাশা, ঘোড়দৌড় নিয়ে ব্যস্ত থাকার স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা হতে পারে না। একজন এথেনীয় ক্রীতদাস, যে কেবল প্রভুর লালসা নিবৃত্তির কাজে ব্যবহৃত, কিংবা বস্তির একজন অশিক্ষিত মাতালকে সেখানে রেখে দেয়াতে রাষ্ট্রের যে নিস্পৃহতার বহি:প্রকাশ ঘটে, তাকে স্বাধীনতার অভিব্যক্তি বরা যায় না।

গ্রীনের মতে, নৈতিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো স্বাধীনতা নেই। সেটাই প্রকৃত স্বাধীনতা যা নৈতিক জীবন গড়ে তোলার সহায়ক। এমন স্বাধীনাতর পথে বাঁধা অনেক এবং মানুষের একক বিক্ষিপ্ত প্রয়াসে তা দূরীকরণ অসম্ভব। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ এজন্যেই জরুরি। ব্যক্তির ইতিবাচক নৈতিক জীবন কেমন হবে, তা সে নির্ধারণ করবে। রাষ্ট্র সেক্ষেত্রে পস্তক্ষেপ করবে না। আবার ঐ নৈতিক জীবন লাভের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ অপসারণে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে, প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখবে। এমন হস্তক্ষেপ স্বাধীনতা বিরুদ্ধ নয়। উপযোগবাদীগণের সঙ্গে গ্রীনের অক্সফোর্ড আদর্শবাদ এখানেই স্বতন্ত্র।

গ্রীনের ব্যক্তি স্বাধীনতার চিন্তা হতে এটি স্পষ্ট যে, রাষ্ট্র সে ক্ষেত্রে কোনো নেসেসারী ইভিল বা প্রয়োজনীয় আপদ নয়। রাষ্ট্র উল্টো নেসেসারী গুড বা প্রয়োজনীয় কল্যাণ। রাষ্ট্রের মাধ্যমেই মানুষ তার নৈতিক পূর্ণতার আদর্শ হাসিল করতে পারে। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্র আবশ্যকীয় ও কল্যাণকর। তা ছাড়া নৈতিকতা ও কল্যাণের বিবেচনা ছাড়াও আইনের দৃষ্টিতেও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অনিবার্য। কেননা সমাজে একমাত্র রাষ্ট্রই বৈধ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার প্রতিষ্ঠান এবং এই আইনই অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা বিধানকারী। গ্রীন মনে করেন নৈতিক চেতনাবোধই মানুষকে জানিয়ে দেয় তার কি করা উচিৎ আর কি করা উচিৎ নয়। ওদিকে অশিক্ষা, অজ্ঞতা, ঔদাসীন্য, নৈতিকবোধের অভাব মানুষের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক। রাষ্ট্র প্রতিবন্ধকতার কবল থেকে মানুষের জীবন ও স্বাধীনতাকে নির্বিঘ্ন করে। এ কাজে বলপ্রয়োগের আবশ্যকতা রয়েছে এবং বল প্রয়োগের বৈধ ও স্বীকৃত মাধ্যম হচ্ছে রাষ্ট্র।

রাষ্ট্র মানুষের অধিকার ও যাবতীয় আইনের একমাত্র উৎস। এটি বল প্রয়োগের মাধ্যম। তাই এটি সর্বাধিক শক্তিশালী সংস্থা। গ্রীন এ মত পোষণ করেন। আর্নেস্ট বার্কার তাঁর "পলিটিক্যাল থট ইন ইংল্যান্ড" গ্রন্থে ঠিকই বলেছেন, রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পূর্বে পারিবারিক পর্যায়ে কিছু অধিকার থাকলেও বস্তুত যাবতীয় অধিকার তখন কেবল আদর্শগত পর্যায়ে কল্পনা করা যায় তবে বাস্তবে তা অর্থহীন। আবার ঐ অধিকারগুলোই যখন রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত তখন তা আদর্শ থেকে বাস্তবে অনুভূত হয়, মানুষের প্রকৃত অধিকারে রূপ পায়।

কান্টের দ্বারা গ্রীন প্রভাবিত হলেও রাষ্ট্রের গৌরব বাড়াতে গিয়ে তিনি কান্টের মতো সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠী, সংঘ, করপোরেশনের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন নি। গ্রীনের মতে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো অধিকার না থাকলেও রাষ্ট্রের বাইরে মানুষের অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রের মাধ্যমে, এর স্বীকৃতিতেই মানুষ অন্যান্য সংঘের অধিকার ভোগ করে।

রাষ্ট্র ও আইনের প্রতি মানুষের আনুগত্যের কারণ

রাষ্ট্র ও আইনের প্রতি মানুষের আনুগত্যের কারণ কি ? এর উত্তর নানারূপ। যেমন, শক্তির ভয়ে মানুষ রাষ্ট্রকে মেনে নেয়। কারো মতে, আনুগত্য প্রকাশের পেছনে সচেতন মনের ভূমিকা নেই, কেবল অভ্যাসই ক্রিয়াশীল। উপযোগীবাদীদের ধারণা, এমন মান্যতায় মানুষের আনন্দ বর্ধিত হয়, সে জন্যে মানুষ রাষ্ট্র ও আইনকে মানে। গ্রীন রাষ্ট্র ও আইন মানার প্রশ্নে স্পিনোজা, হব্‌স, লক, রুশোর অভিমতকে ভিত্তিহীন বলে মনে করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র মানুষের নৈতিক জীবন সৃজনে যতটা অবদান রাখতে পারে বা রাখে, তার ভিত্তিতেই মানুষ রাষ্ট্র ও আইনকে মান্য করে। গ্রীনের মতে, মানুষের ইচ্ছা ও প্রজ্ঞার সামর্থ্যসমূহ যাতে সে অবাধে ব্যবহার করতে পারে বহিঃশক্তি দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিজের সম্ভাব্য সন্তোষের মধ্যে ও নৈতিকতার ভিতর থেকে, সেটা সম্ভব করে তোলাই পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ। রাষ্ট্র এ দায়িত্ব আরো বড় পরিসরে পালন করে। মানুষ প্রজ্ঞা ব্যবহার করে 'self perfection' বা আত্মপূর্ণতা লাভ করতে পারে। সামাজিক সংগঠনসমূহ এবং রাষ্ট্র তাকে এ কাজে সহায়তা দেয়। কিন্তু মানুষের নৈতিকবোধ, প্রজ্ঞা ও ইচ্ছাই এ ক্ষেত্রে মূল্যবান। তাই রাষ্ট্রসহ যাবতীয় সামাজিক সংগঠনের প্রকৃত ভিত্তি হলো নাগরিকগণের নিজস্ব ইচ্ছা, বাইরের কোনো বলপ্রয়োগ নয়। গ্রীন বলেন, ''Will, not force, is the basis of the state." গ্রীনের মতে, নৈতিক জীবনের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক একান্তই সহায়কমূলক, সৃষ্টিমূলক নয় (auxiliary, not creative)। অর্থাৎ মানুষের স্বাধীনতা ও নৈতিক জীবন অর্জনের প্রশ্নে, কল্যাণ হাসিলের ব্যাপারে রাষ্ট্র জরুরি এবং তা প্রতিবন্ধকতা অপসারণকারী। রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ও হস্তক্ষেপ এ জন্যে দরকার, কিন্তু তা মানুষের ইচ্ছার ভিত্তিতেই।

সরকারের শ্রেণীবিভাগ

গ্রীন মনে করেন, একটি রাষ্ট্র যতক্ষণ তার উপরোক্ত যথার্থ ভূমিকা পালন করে, ততক্ষণ সে মানুষের নিরঙ্কুশ আনুগত্য দাবি করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে, নিপীড়ক হয়ে উঠলে মানুষের অধিকার আছে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাবার। গ্রীন লোকায়ত সরকার (popular government) এবং স্বৈরাচারী সরকার (tyrannical government) - এই দুই মূল বিভাজন টেনেছেন সরকার প্রশ্নে।

নিয়মতন্ত্র ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ

গ্রীন মনে করেন, লোকায়ত সরকার কোনো দেশে বিদ্যমান থাকলে এবং আইন প্রণয়ন ও বাতিলকরণের সংবিধানসম্মত পদ্ধতি থাকলে, নাগরিকদের কর্তব্য নিয়মতান্ত্রিক ও সংবিধানসম্মত পথে অবাঞ্ছিত আইন বদল ও বাতিলের চেষ্টা করা। যতক্ষণ না তা পরিবর্তিত হয়, তা ততক্ষণ মেনে চলা। কিন্তু স্বৈরাচারী সরকারের জনস্বার্থ ও কল্যাণ বিরোধী আইন ও জনস্বার্থ বিরোধী কাজ-কারবার না মানা, এ সবের বিরোধিতা করা এবং সে ক্ষেত্রে আইন

ল ঘন নাগরিকদের জন্য একান্ত করণীয়। গ্রীন মনে করেন, সার্বিক সামাজিক সৎ ও কল্যাণময় জীবনের বিপরীতে না গেলে আইন মানতে হবে। কোনো নাগরিকের যা ইচ্ছা করার স্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দেয়া যায় না। রাষ্ট্রের কোনো আইন সমাজ কল্যাণের বিপরীতে গেলে সে সম্পর্কে নাগরিক সাধারণকে সচেতন হতে হবে এবং তা তাদের উপলব্ধিতে থাকতে হবে। তবেই কেবল রাষ্ট্রীয় আইনের বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে।

মূল্যায়ন

গ্রীন হেগেলের মতো সমাজ ও রাষ্ট্রকে একীভূত (identify) করে দেখেন নি। তিনি সমাজকে রাষ্ট্র অপেক্ষা বড় মনে করেছেন ও উচুঁতে স্থান দিয়েছেন। গ্রীন হেগেলের মতো সর্বাত্মকবাদী ছিলেন না, যদিও আদর্শবাদী ছিলেন। রাষ্ট্র, আইন, অধিকার, নৈতিকতা, মানুষের স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রশ্নে গ্রীন বেন্থামের উপযোগবাদ এবং হেগেলের ভাববাদ অপেক্ষা অনেক বেশী বাস্তবমুখীনতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি কান্টের চেয়েও এগিয়ে রয়েছেন। সামাজিক কল্যাণবোধ, ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকার, রাষ্ট্রের দায়, আইনের মান্যতা, নাগরিকদের দ্রোহের চূড়ান্ত সুযোগ প্রশ্নে গ্রীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জগতকে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি বাস্তবানুগ ও পরিশীলিত করেছেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সারকথা

গ্রীনের দর্শনে বলপ্রয়োগ নয়, বরং নাগরিকদের ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি। গ্রীন হেগেলের মতো সমাজ ও রাষ্ট্রকে একীভূত করে দেখেননি। সমাজকে রাষ্ট্র অপেক্ষা বড় ও উঁচুতে স্থান দিয়েছেন। তিনি আদর্শবাদী হলেও সর্বাত্মকবাদী ছিলেন না। রাষ্ট্র, আইন, অধিকার, নৈতিকতা, মানুষের স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রশ্নে তিনি বেন্থামের উপযোগবাদ, হেগেলের ভাববাদ এবং কান্টের দর্শন অপেক্ষাও অগ্রসর। রাষ্ট্র ও আইনের প্রতি মানুষের আনুগত্যের কারণ সম্পর্কে গ্রীনের ব্যাখ্যা অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। টমাস হিল গ্রীনের সারাটি জীবন অতিবাহিত হয় -

ক) ক্যামব্রিজে; খ) অক্সফোর্ডে ;

গ) লন্ডনে; ঘ) হিল্টনে।

২। Will, not force is the basis of the state - এ উক্তিটি কে করেন?

ক) টমাস হিল গ্রীন; খ) ম্যাকাইভার;

গ) ম্যাক্সওয়েভার; ঘ) মঁন্টেস্কু।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। ব্যক্তি স্বাধীনতার অর্থ কী?

২। রাষ্টীয় স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা কী?

৩। গ্রীনের মতে কেন মানুষ আইনের প্রতি অনুগত হয়?

৪। ‘শক্তি নয় ইচ্ছাই হলো রাষ্ট্রের ভিত্তি’ - এ কথার ব্যাখ্যা কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। টি এইচ গ্রীনের রাষ্ট্র দর্শনের বর্ণনা দিন।

সঠিক উত্তর

১। খ, ২। ক

পাঠ - ৯

রাষ্ট্রদর্শনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ : অগাস্ট কোঁৎ (১৭৯৮-১৮৫৭ খ্রিঃ)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- অগাস্ট কোঁতের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের স্বাধীনতা ও বিদ্রোহের বোধ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- কোঁতের দৃষ্টবাদী দর্শন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- সমাজ সংস্কার প্রয়াসে কোঁতের দর্শনে প্রদত্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হবেন এবং তাঁর দর্শনের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এবং স্ববিরোধ সম্পর্কে বিশ্লেষণ দিতে পারবেন।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টবাদ, ব্যক্তিজীবন ও বৈশিষ্ট্য

সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতি হিসেবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টবাদের জনক অগাস্ট কোঁতের জন্ম ১৭৯৮ সালে ফ্রান্সের মন্টপোলিয়ারে। ঊনিশ শতকে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন গণিত, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, নৃতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা মানবিক চিন্তা ও ধারণাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। এক নয়া দিগন্ত উন্মোচিত হয় জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মানুষের সমাজ জীবনে মানবিক সমস্যার সমাধানকল্পে। রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ রাষ্ট্রতত্ত্বের মৌল নীতির জন্য বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করেন। রাষ্ট্র ও কর্তৃত্বের নয়া ব্যাখ্যা প্রদান এবং মানুষের সমস্যাসমূহের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও সমাধানের জন্য যারা এই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহারে সর্বাধিক এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে অগাস্ট কোঁতে, হার্বার্ট স্পেনসার, ওয়াল্টার বেইজহট, গ্রাহাম ওয়ালাস প্রমুখের নাম খ্যাত। ১৮৩০ থেকে ১৮৪২ সালের মধ্যে কোঁতের মূল গ্রন্থ "পজিটিভ ফিলোসফি" ছয় খন্ডে প্রকাশিত হয়। এরপর ১৮৫১ থেকে ১৮৫৪ সালের মধ্যে তাঁর অপর প্রধান গ্রন্থ "পজিটিভ পলিটি" চার খন্ডে প্রকাশিত হয়।

স্বীয় রচনায় রাষ্ট্রতত্ত্বের বিজ্ঞানধর্মী বিশ্লেষণকে অগাস্ট কোঁতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টবাদ (Scientific Positivism) বলে আখ্যা দেন। এই ধারার মূল বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতি প্রয়োগকরত: মানুষের সমাজ এবং সামাজিক সমস্যারাজির সমাধান অনুসন্ধান করা হয়। "পলিটিক্যাল ফিলোসফিজ" গ্রন্থে ব্যাখ্যাকৃত চেস্টার সি. ম্যাক্সীর ভাষায়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টবাদই ঊনিশ শতককে বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। দৃষ্টবাদ পদ্ধতির মূল বিশেষত্বই হচ্ছে সমাজ জীবন সম্পর্কে নানা তথ্য জোগাড় করে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কহীন বিমূর্ত ধারণার (abstract ideas) অথবা অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসের (transcendental beliefs) কোনো অবকাশ রাখেনি এই পদ্ধতি। দৃষ্টবাদী দর্শনের একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অভিজ্ঞতাবাদ। জার্মান দার্শনিক গাইডো ডি রাগীরোর মতে, দৃষ্টবাদ এরূপ এক দার্শনিক প্রবণতা যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত এবং প্রাকৃতিক ও মানবিক উভয় প্রকারের দৃশ্যমান জগত (world of phenomena) সম্পর্কে এক ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য।

দৃষ্টবাদী তিনপর্ব তত্ত্ব

কোঁতের দর্শন সেইন্ট সিঁমোর মূল চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত। সিঁমোই তাঁকে প্রথমতঃ শিক্ষা প্রদান করেন যে, সামাজিক ঘটনাসমূহ প্রাকৃতিক ঘটনার ন্যায়ই আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাপারে প্রযোজ্য পদ্ধতিতে সামাজিক ঘটনারাজিরও শ্রেণীবিন্যাস ও বিশ্লেষণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত: সিঁমোই তাকে শেখান যে, দর্শনের আসল উদ্দেশ্য হলো সামাজিক জীবনের

নিয়মসমূহ আবিষ্কার করা এবং রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক ব্যবস্থাসমূহের যুক্তিসঙ্গত পুনর্গঠন সাধন করা।

এ দু'টি মূল শিক্ষা নিয়ে কোঁতে তাঁর দর্শনের "তিন পর্ব তত্ত্ব" (Theory of three stages) প্রদান করেন। মানবিক চিন্তাধারা এই তিন পর্বের মাধ্যমে বিকশিত হয় - (১) ধর্মতাত্ত্বিক (Theological stage), (২) আধ্যাত্মিক (Metaphysical stage) এবং (৩) বৈজ্ঞানিক বা দৃষ্টবাদ পর্ব (Positive stage)।

ধর্মতাত্ত্বিক পর্বে মানুষ সকল কিছুকে ব্যাখ্যা করে অতিপ্রাকৃতিক কারণের সহায়তায়। সর্বপ্রাণবাদ (animism) হতে আরম্ভ করে বহুঈশ্বরবাদ (polytheism) এর ভিতর দিয়ে একেশ্বরবাদে (monotheism) পৌঁছায় মানুষ। বিকাশের প্রথম এই পর্বটির সময়কাল অতি আদিম যুগ থেকে মধ্যযুগ অবধি প্রসারিত। বলপ্রয়োগ এ পর্বে সামাজিক সম্পর্কসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে। শক্তি বা বাহুবলের জোরে বিজয়ও প্রতিষ্ঠা অর্জনই এ যুগের মূল বৈশিষ্ট্য। শিল্পের ভূমিকা এখানে নিতান্তই কম, আর উৎপাদনকারীগণ থাকে দাসের ভূমিকায়।

ইতিহাস এগোয় ক্রমধারায়। মানুষ বিকাশের দ্বিতীয় পর্বে পৌঁছায়। এক্ষেত্রে কিছুসংখ্যক বিমূর্ত ধারণা একেশ্বরবাদ বা বহুঈশ্বরবাদের স্থানে আসন নেয়। এ সময় প্রকৃতি ঈশ্বরের আসন পায়। সামাজিক চুক্তি, প্রাকৃতিক অধিকার, জনগণের সার্বভৌমত্ব - এসব কল্পকথাসমূহ এ যুগের সমাজ দর্শনে প্রাধান্যশীল হয়ে উঠে। সামরিক এবং শিল্পযুগের সন্ধিক্ষণ এটা। বিকাশের প্রথম পর্বের দাসপ্রথা এবারের দ্বিতীয় পর্বে ভূমিদাস প্রথায় রূপ পায় এবং ভূমিদাসেরা অর্জন করে খানিকটা পৌর অধিকার। এ পর্বে শিল্পের ভূমিকা আগের চেয়ে বেশি হলেও, তা এখনও সামরিক লক্ষ অর্জনার্থেই ব্যবহৃত। কোতেঁর মতে, এই দ্বিতীয় পর্ব অন্তর্ববর্তীকালীন ও অনিশ্চিত এবং এর বিস্তার সমগ্র আঠারো শতক জুড়ে।

কোতেঁর তৃতীয় সর্বোচ্চ পর্বটি বিজ্ঞান বা শিল্প সমাজের পর্ব। তিনি একে দৃষ্টবাদী (positivist) বলেও আখ্যা দেন। এ পর্বে পূর্বের বিমূর্ত সকল প্রকার আধ্যাত্মিক ধারণাকে বাদ দিয়ে নিজেকে পুরোপুরি বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যে নিয়ে আসে মানুষ। এ যুগে পর্যবেক্ষণের পথেই ঘটনারাজির ও বিষয়াদির বিচার-বিশ্লেষণ করে মানুষ। এই প্রক্রিয়ায় মানুষ বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তায় বিশিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। আর. চ্যামবি- স তাঁর "স্যোশাল থট" গ্রন্থে ব্যাখ্যা দেন যে, কোঁতের দৃষ্টবাদী চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষ স্বীয় সীমার মাঝে সর্বোচ্চ জ্ঞানের আকর হিসেবে অভিজ্ঞতা থেকে উত্থিত বৈজ্ঞানিক বিধিকে মেনে নেয়। জন এইচ.হ্যালোয়েল তাঁর "মেইন কারেন্টস ইন মডার্ন পলিটিক্যাল থট" গ্রন্থে বলেন, তৃতীয় এই পর্বে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারপূর্বক পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা ও সামাজিক সৌহার্দ্যের দিকে অগ্রগতির আকাঙ্খখা প্রকাশ করে মানুষ। শিল্পের ভূমিকা হয় প্রাধান্যশীল। সমাজের তৎপরতা মূলত: উৎপাদন লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। উনিশ শতকের বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের ইতিহাসকে নিশ্চিতরূপে দৃষ্টবাদের পর্বে উপস্থিত করে।

কোঁতের এই তৃতীয় পর্ব তথা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টবাদ পর্বেই অস্থিরতা ও কলহ-কোন্দলের সমাপ্তি টেনে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা ও সামাজিক সৌহার্দ্যের জীবনে পৌঁছানোর জন্য তিনি এক নতুন বিজ্ঞানের আবশ্যকতা অনুভব করেন। এরই ফলে প্রথমে 'Social physiology বা Social Physics এবং পরে ঝড়পরড়ষড়মু শব্দটি তিনি উদ্ভাবন করেন। কোঁতে প্রদত্ত সূত্র হচ্ছে অগ্রগতির মাধ্যমে শৃঙ্খলা বিকাশ লাভ করে" (progress is the development of order)। কোঁতের ভাষায় অগ্রগতির এই নির্ভুল তত্ত্বের মাধ্যমে 'Social Statics` Ges 'Social Dynamics' এর মধ্যে যখন সংযোগ সাধিত হয়, তখনই কেবল দৃষ্টবাদী বিজ্ঞানের মাধ্যমে সামাজিক শক্তির এরূপ এক সামঞ্জস্যপূর্ণ সংগঠন সম্পন্ন হয় যখন কি-না সমাজ বিজ্ঞানের গঠন সমাপ্তি পায়। কোঁতে সমাজবিজ্ঞানকে সকল বিজ্ঞানের রাণী হিসেবে আখ্যা দেন। তিনি

বলেন, মধ্যযুগে ধর্মতত্ত্ব যে ভূমিকা পালন করতো, আধুনিক জগতে সমাজবিজ্ঞান সেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ। তিনি সবরকম বিজ্ঞানকে এক স্তরক্রমিক পর্যায়ে (hierarchical order) বিন্যস্ত করেন। তাঁর মতে, এহেন বিন্যাস কেবল ইতিহাসের ক্রমই নির্দেশ করে না, এটা বিকাশের এক যৌক্তিক ক্রমও তুলে ধরে। অন্য কথায় বিজ্ঞান সহজ সরল অবস্থা থেকে ক্রমশ জটিল অবস্থার দিকে এগোয়। তাঁর মতে, এই ক্রমের গোড়াতে গণিত এবং এরপর আসে জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা ও সমাজ বিজ্ঞান। কোঁতের মতে, দৃষ্টবাদ পর্বে পৌঁছানোর জন্য সমাজবিজ্ঞানসহ সকল বিজ্ঞানকেই তিন পর্বের নিয়মের মাঝ দিয়ে এগোতে হয়।

তাঁর অদ্ভুত ধর্মবিশ্বাস ও এর অসঙ্গতি

কোতেঁ প্রচলিত খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিক যুগের প্রয়োজনের নিরীখে অপর্যাপ্ত ও অনুপযোগী মনে করলেও নতুন এক অদ্ভুত ধর্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়ার প্রয়াস চালান। কোতেঁর মতে, ধর্মবিশ্বাস ব্যতীত মানুষ বাচেঁ না। তিনি বলেন, মানুষের জ্ঞান ও বিবেকের মধ্যে অর্থাৎ মন ও অন্তরের ভিতর সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই ধর্ম আবশ্যক। কেননা শুধু ধর্মের মাধ্যমেই ব্যক্তি নিজের জীবনের চূড়ান্ত পূর্ণতা আর পরিতৃপ্তি হাসিল করতে পারে। তবে কোঁতে খ্রিস্ট ধর্ম বর্জন করেন কারণ এর সনাতন বিশ্বাসসমূহ বিজ্ঞানের সঙ্গে মেলে না। তাই কোঁতে “মানবতার ধর্ম” নামে এক নয়া ধর্মমত প্রদান করেন। তিনি তাঁর আবিষ্কৃত সমাজবিজ্ঞানের বিধানসমূহকে ধর্মবিশ্বাসের মর্যাদা দিয়ে মানুষকে এক নতুন উপাসনায় উদ্বুদ্ধ করতে চান। সেক্ষেত্রে ‘মেসায়াহ’ নন, মানবতাই লক্ষ্য। কোঁতে মানবতা বলতে সে সব মানুষকে বোঝান যারা যুগে যুগে অগ্রগতি অর্জনে অবদান রেখেছেন। এল.ডব্লিউ. ল্যাঙ্কাস্টারের ভাষায়, মানবিক অগ্রগতির এই ধারণাই কোঁতের সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করে।

অগাস্ট কোঁতের তথাকথিত মানবতার ধর্মে তিনি খ্রিস্টীয় ঈশ্বরের স্থলে মানবতাকে এবং খ্রিস্টীয় ত্রিত্ববাদ (Trinity) স্থলে “গ্রেট বীয়িং”, “গ্র্যান্ড ফেটিশ” এবং “গ্র্যান্ড মিডিয়াম” ত্রিত্ববাদ তুলে ধরেন। খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জীর স্থানে তিনি তের মাস বিশিষ্ট দৃষ্টবাদী বর্ষপঞ্জীর প্রচলন চান। কোঁতের মতে, মানবতার ধর্মে ঈশ্বরের প্রশংসা না করে মানবতা ও সরকারী সেবা কর্মের প্রশংসা গাইতে হবে। এ উদ্দেশ্যে তিনি স্তুতিসঙ্গীত (hymns) রচনার কথাও বলেন। কোঁতের মতে, মানবতার ধর্মে যারা পুরোহিত হবেন তাদেরকে বিজ্ঞানের সকল শাখায় প্রশিক্ষিত হতে হবে এবং সর্বত্র নতুন মানবতার ধর্মকে সমর্থন করতে হবে। কোঁতে তাঁর নব ধর্মে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং এমনকি নির্দেশ দেন যে, পুরুষরা নারী জাতির উপাসনা করবে।

কোঁতের এই তথাকথিত মানবতার ধর্ম ও নারী পূজার পাগলামীকে স্কটল্যান্ডের প্রখ্যাত দার্শনিক এডওয়ার্ড কেয়ার্ড তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বলেছেন, এটা মোটেই কোনো ধর্ম নয়। প্রফেসর হ্যালোওয়েলের ভাষায়, কোঁতের এসব বক্তব্য আত্মপ্রবঞ্চনার সামিল।

রাষ্ট্র ও শাসন পরিকল্পনা

কোঁতে তাঁর দৃষ্টবাদী দর্শন দ্বারা বড় বড় রাষ্ট্রসমূহ ভেঙ্গে ছোট করতে চেয়েছেন। ইউরোপের বৃহৎ পাঁচ রাষ্ট্র ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানী, ইতালীকে ভেঙ্গে ৭০টি প্রজাতন্ত্রে ভাগ করা এবং পুরো দুনিয়াকে ৫০০ প্রজাতন্ত্রে ভাগ করার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। কোনো প্রজাতন্ত্রে ৩০ লাখের উপর জনসংখ্যা হবে না। দেশের জনগণকে তিনি “প্যাট্রিশিয়ান” ও “প্রলিটারিজ” - এই দুই শ্রেণীতে বিভক্তকরণ এবং এদের অনুপাত ১ ঃ ৩০ হবে বলে মত দেন। প্যাট্রিশিয়ানদের হাতে তিনি কৃষি, বাণিজ্য এবং ম্যানুফেকচারিং -এর কেন্দ্রীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি দেশের শাসনক্ষমতা ‘ট্রায়াম্ভিরেট’ এর বা ত্রয়ী সংস্থার হাতে ন্যস্ত করার পরামর্শ দেন এবং এটি হবে দেশের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক রিপাবলিকে ৩০ জন ব্যাঙ্কারের সমন্বয়ে এই ‘ট্রায়াম্ভিরেট’ গঠিত হবে। চিন্তার প্রসারতায় ও অনুভূতির উদারতায় ৪২ বছর বয়সে তিনজন সর্বোচ্চ যোগ্যতার অধিকারী ব্যাঙ্কার “মানবতার সর্বোচ্চ পুরোহিত”

(High Priest of Humanity) রূপে ক্ষমতাসীন হবে এবং কৃষি, বাণিজ্য ও ম্যানুফ্যাকচারিং -এর দায়িত্বে থাকবে।

সমালোচনা ও তাৎপর্য

অগাস্ট কোঁতের রাজনৈতিক চিন্তা ও রাষ্ট্রদর্শনের গভীর আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি eccentric mind বা ঔৎকেন্দ্রিক মানসিকতার একজন মানুষ। তাঁর অনেক বক্তব্যই অবাস্তব এবং নিছক হাস্যকর। এগুলো ক্ষেত্র বিশেষে তাঁর মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগায়। কোঁতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতাবাদকে কাজে লাগিয়ে তাঁর দৃষ্টবাদী দর্শন দ্বারা সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার ও খ্রিস্টধর্মকে কল্পকাহিনী ও অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসের হাত থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। রাষ্ট্রচিন্তাকে বস্তুনিষ্ঠ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। চৌদ্দ শতকের মুসলিম বিজ্ঞানী দার্শনিক ইব্‌ন খালদুন ও আঠারো শতকের ফরাসী দার্শনিক মন্তেস্কু সমাজবিজ্ঞানকে জ্ঞানের স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস পেলেও 'সমাজবিজ্ঞান' (Sociology) শব্দ থেকে শুরু করে জ্ঞানের জগতে এর স্বতন্ত্র বিজ্ঞানসম্মত শাখার অবস্থান লাভ কোঁতের চেষ্টারই ফল। স্পেনসার, পার্সনস, দুর্খাইম, গুস্তাব লেবন, ওয়ার্ড - এসব সমাজবিজ্ঞানী কোঁতের অনুসরণেই সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়েছেন।

তবে কোঁতে তাঁর দৃষ্টবাদী দর্শনে মানসিক ভারসাম্যহীনতার স্পষ্ট প্রমাণ রেখেছেন। ধর্মকে তথা খ্রিস্টধর্মকে বাদ দিয়ে নাস্তিকের অবস্থান নিলেও তথাকথিত মানবতার ধর্ম-এর মাধ্যমে তিনি বিধাতাকে সরিয়ে দিয়ে Trinity বা ত্রিত্ববাদের অদ্ভুত ব্যাখ্যা দেন। তাঁর কর্তৃক উল্লেখিত 'গ্রেট বীয়িং'-এর বিমূর্ত সত্তা কোনোভাবেই আস্তিকতা (theism) কে প্রতিষ্ঠা করে না। নারীকে সমাজ কল্যাণ ও সর্ব মঙ্গলের উৎস বানিয়ে তিনি তাদেরকে দেবীর আসনে বসিয়ে পুরুষ কর্তৃক তাদের কাছে নতজানু হয়ে পূজা বা উপাসনার যে তত্ত্ব দিয়েছেন, তাতে করে নারীকে 'গ্রেট বীয়িং' বানানোর প্রচেষ্টা চললেও বিষয়টি মানসিক অসুস্থতারও বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে বলে অনেকে মনে করে থাকেন।

মূল্যায়ন

এতদ্ব্যতীত কোঁতের 'তিন পর্ব' ভিত্তিক বিবর্তন ও প্রগতি তত্ত্বও পরবর্তীকালের সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেন নি। কোঁতে যখন বলেন, দৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যেই মানুষের স্থান সীমিত থাকবে; দৃষ্টের বাইরে কোনো কিছু অনুমানের ক্ষমতা মানুষের নেই, তখন তাঁর দৃষ্টবাদ বাস্তবিকই অবৈজ্ঞানিকতার পরিচায়ক হয়ে উঠে। আবার, সামাজিক পরিবর্তন আর প্রগতি যে এক কথা নয়, এটাও কোঁতে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। এ ছাড়া কোঁতে তথাকথিত মানবতার ধর্মের বাগাড়ম্বর করলেও তিনি সমাজকে উঁচু-নীচু দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। প্যাট্রিশিয়ান ও প্রোলিটারিজ - এই দুই ভাগে সমাজকে ভাগ করার মাধ্যমে মাত্র স্বল্প সংখ্যক মানুষকে মর্যাদা, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের আসনে বসিয়ে সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে কোঁতে শ্রমজীবী ও শোষিত পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন। অর্থাৎ মানব সমতা কোঁতের দর্শনে বরাবর অনুপস্থিত থেকেছে। এরপরও কোঁতের দৃষ্টবাদী দর্শনের মাধ্যমেই সমাজবিজ্ঞান আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেছে, এটা বলা যেতে পারে।

সারকথা

অগাস্ট কোঁতে দৃষ্টবাদী দর্শন তুলে ধরেন তাঁর লেখায়। তিনি আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের উদ্গাতা। কোঁতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতাবাদকে কাজে লাগিয়ে তাঁর দৃষ্টবাদী দর্শন দ্বারা সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার ও খ্রিস্টধর্মকে কল্পকাহিনী ও অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসের হাত থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। রাষ্ট্রচিন্তাকে বস্তুনিষ্ঠ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। কোঁতের দৃষ্টবাদ পদ্ধতির মূল বিশেষত্বই হচ্ছে সমাজ জীবন সম্পর্কে নানা তথ্য যোগাড় করে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। তবে কোঁতের দৃষ্টবাদী দর্শনে পরস্পর বিরোধিতা, অবাস্তবতা ও মানসিক ভারসাম্যহীনতার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। আগস্ট কোঁতের জন্ম কত সালে?

ক) ১৭৯৮;

খ) ১৮৯৮;

গ) ১৯৯৮;

ঘ) ১৬৯৮।

২। আগস্ট কোঁতের দর্শন প্রভাবিত-

ক) প্লাটোর দর্শন দ্বারা;

খ) এরিস্টটলের দর্শন দ্বারা;

গ) সক্রেটিসের দর্শন দ্বারা;

ঘ) সেইন্ট সিমোর দর্শন দ্বারা।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিবাদ কী?

২। কোঁতের তিন পর্ব তত্ত্ব কী?

৩। মানবতার ধর্ম বলতে কোঁতে কী বুঝতে চেয়েছেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কোঁতের রাজনৈতিক দর্শন ও সৃষ্টি ভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তর

১। ক, ২। ঘ

পাঠ - ১০

হার্বার্ট স্পেনসার (১৮২০-১৯০৩ খ্রিঃ)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্পেনসারের উপর উপযোগবাদী বিশেষতঃ বেন্থামীয় উপযোগবাদের প্রভাব সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- স্পেনসারের ‘নন কনফর্মিজম’ ও ‘লেসেফের’ দর্শন ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- স্পেনসারের ডারউইন-পূর্ব বিবর্তনবাদ এবং চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সম্পর্কে বিশ্লেষণ দিতে পারবেন;
- স্পেনসারের রাষ্ট্রচিন্তার বিশেষ চরিত্র বৈশিষ্ট্য বুঝতে সমর্থ হবেন।

ভূমিকা

ইংল্যান্ডের ডার্বিতে ১৮২০ সালে স্পেনসারের জন্ম। ব্রিটিশ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিক অগাস্ট কোঁতের ন্যায় দৃষ্টবাদ কথাটি ব্যবহার করেননি তাঁর রচনায়। কিন্তু স্পেনসারও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিশেষত: জীববিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার এবং রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যেকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ কারণে ভাষাকারগণ তাঁকেও দৃষ্টবাদী দর্শনের প্রবক্তা বলে মনে করেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হওয়াতেই স্পেনসারের দর্শনে বিবর্তনবাদ, রাষ্ট্রের জৈবিক মতবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের সম্মিলন লক্ষণীয়।

ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক পরিমন্ডল ও রচনাবলী

ইংল্যান্ডের ডার্বিতে ১৮২০ সালে স্পেনসারের জন্ম। একযোগে পারিবারিক দারিদ্র ও বংশগত বিদ্রোহী ঐতিহ্যের কারণে উচ্চ শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হয় নি স্পেনসারের পক্ষে। তবে স্বীয় মেধা ও প্রচেষ্টাকে ব্যবহার করে ইঞ্জিনীয়ারিং-এ তিনি গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে নিয়োগ পেয়ে তিনি লন্ডন এবং বার্মিংহামে ১০ বছর চাকুরী করেন। এরপর ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল তিনি দুনিয়াখ্যাত “দি ইকোনমিস্ট” পত্রিকার প্রথমে সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি “নন-কনফর্মিস্ট” পত্রিকায় ‘দি প্রপার স্ফীয়ার অব গভর্নমেন্ট’ শিরোনামে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। স্পেনসারের লেখক খ্যাতি এখান থেকেই প্রসারিত হয়। ‘ইকোনমিস্ট’-এর সম্পাদক পদে অবস্থানের সময়ই স্পেনসারের খ্যাতনামা গ্রন্থ “দি সোশ্যাল স্ট্যাটিক্স” প্রকাশিত হয় ১৮৫১ সালে। ১৮৫৩ সালে ‘ইকোনমিস্ট’ পত্রিকার চাকুরী ত্যাগ করার পর স্পেনসারের যে সব বই প্রকাশিত হয় তার ভিতর রয়েছে ঃ ‘প্রিন্সিপল্স অব সাইকোলজি”(১৮৫৫), “ফার্স্ট প্রিন্সিপল্স”(১৮৬২), ‘প্রিন্সিপল্স অব সোশিওলজি”(১৮৭৩), “দি ম্যান ভার্সাস দি স্টেট”(১৮৮৪) এবং মরণোত্তর “অটোবায়োগ্রাফী” (১৯০৪)। এখনকার ভিন্ন পৃথিবীতে এগুলোর পাঠ উঠে গেলেও এক সময় ব্রিটেন, আমেরিকায় স্পেনসারের এসব বই বহুলভাবে পঠিত হয়েছে।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যায়ন ও ডারউইন-পূর্ব বিবর্তনবাদ

হার্বার্ট স্পেনসারের রাষ্ট্র দর্শনের মূল দু’টি দিক হচ্ছে চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ(র‌্যাডিকাল ইনডিভিজ্যুয়ালিজম) এবং ডারউইন-পূর্ব বিবর্তনবাদ(প্রি-ডারউইনিয়ান ইভোলিউশন)।

সমকালের দর্শন ও বিজ্ঞানের সরাসরি প্রভাব স্পেনসারীয় দর্শনে লক্ষণীয়। জন বাউল তাঁর "পলিটিক্স এ্যান্ড ওপিনিয়ন ইন দি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী" গ্রন্থে মত প্রকাশ করেছেন যে, স্পেনসারের দর্শনে চরমপন্থী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এসেছে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য এবং দুই প্রবল ব্রিটিশ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী উইলিয়াম গডউইন ও টমাস হজকিনের চিন্তা থেকে। এ দু'জন জেরেমী বেন্থামের থেকে খানিকটা আলাদা ধরনের হলেও ব্যক্তির চরম স্বাতন্ত্র্যবাদে আস্থাশীল ছিলেন। সে কারণে তাঁরা মানুষের প্রাকৃতিক অধিকারের নীতি এবং রাজনীতি ও অর্থনীতিতে 'লেসেফের' নীতির উপর জোর দিয়েছেন। এদিকে আর্নেস্ট বার্কার তাঁর "পলিটিক্যাল থট ইন ইংল্যান্ড" গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন যে, বেন্থাম ভিন্নভাবে অর্থনীতিকে প্রকৃতির অবাধ খেয়ালের উপর নির্ভরশীল করে আইন ও রাজনীতিকে বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণের অধীন বলে মত দেন। অপরপক্ষে স্পেনসার বেন্থামীয় উপযোগবাদে বিশ্বাসী হয়েও "সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের আনন্দ" নীতির প্রয়োগের সম্ভাব্যতা নিয়ে সন্দেহ করেন এবং এর কড়া সমালোচনা করেন। স্পেনসারের উপর বরং গডউইন ও হজকিনের চরমবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রভাবই অধিক দৃষ্ট হয়।

জার্মান ভাববাদ ও নন-কনফর্মিজমের প্রভাব

স্পেন্সারের দর্শনের উপর দ্বিতীয় প্রভাবটি আসে কোলেরিজের মাধ্যমে পাওয়া জার্মান ভাববাদ এবং ল্যামার্কের ডারউইন-পূর্ব বিবর্তনের ধারণা হতে। জন বাউল মন্তব্য করেছেন, ল্যামার্ক বিবর্তনের যে ধারণা দেন সেটার ভিতর তিনি পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত চারিত্রিক গুণসমূহের উপর সবিশেষ জোর দিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত, স্পেনসারের পারিবারিক প্রভাব এবং তাঁর চাচা রেভারেন্ড টমাস স্পেনসার ও নটিংহামের জোসেফ স্টার্জ কর্তৃক প্রকাশিত "নন-কনফর্মিস্ট"পত্রিকার সঙ্গে সংযোগ এবং সেখানে 'নন-কনফর্মিজম'-এর পক্ষে লেখার মধ্য দিয়েও তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শন গড়ে উঠে।

স্পেনসার প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জার্মান ভাববাদ - এ দুই পরস্পর সঙ্গতিহীন উপাদানদ্বয় থেকেও প্রভাবিত হন। আর্নেষ্ট বার্কারের মতে, জার্মান ভাববাদের প্রভাব স্পেনসারের দর্শনে পড়ে ইংরেজ দার্শনিক কোলেরিজের মাধ্যমে জার্মান দার্শনিক শেলিং (Schelling)-এর কাছ থেকে।

স্পেনসার তাঁর "সোশ্যাল স্ট্যাটিক্স" গ্রন্থে 'জীবনের ধারণা' বলে যে, প্রত্যয়টি তুলে ধরেন তার উৎস জার্মান ভাববাদ। এ ধারণা মতে, জীবন প্রকৃতির কোনো ঘটনা নয় এবং এটা নির্দিষ্ট কোন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়ও নয়। এটা এক অতীন্দ্রিয় নীতি। এই নীতি অনুয়ায়ী সার্বিকভাবে প্রকৃতি, আর প্রকৃতির অংশরূপে সমাজ বহিমূর্খী প্রবণতার ভিতর দিয়ে চূড়ান্ত 'স্বাতন্ত্রয়নের' (Individuation) পথে বিবর্তিত হয়। এরূপ নীতি অনুযায়ী জীবনই বিশ্বজনীন বিবর্তনের একমাত্র কারণ।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন

তবে এর পরও অর্থাৎ জার্মান ভাববাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও স্পেনসার পরবর্তী সময়ে জীববিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞানের ন্যায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রভাবে চলে যান। ওদিকে অগাস্ট কোঁতের বিবর্তন নীতি বিষয়ে স্পেনসারের কোনো প্রত্যক্ষ ধারণা না থাকলেও ঐশ্বরিক ও অতীন্দ্রিয় ধারণা পরিত্যাগকরতঃ স্বীয় অজ্ঞাতেই তিনি যেন কোঁতীয় দর্শনের কাছাকাছি চলে যান। এভাবে ১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইনের "অরিজিন অব স্পেসিস" রচিত হবার আট বছর আগেই স্পেনসার 'যোগ্যতমের উর্দ্বতন'(সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট) নীতির বিকাশ ঘটান। স্পেনসারের বিবর্তন তত্ত্বকে এজন্যে "ডারউইনপূর্ব বিবর্তনবাদ"(প্রি-ডারউইনিয়ান থিওরী অব ইভোলিউশন) আখ্যা দেয়া হয়। এ ছাড়া স্পেনসার যথাক্রমে জীববিজ্ঞানী জে.বি.ল্যামার্ক এবং সমাজবিজ্ঞানী এইচ.টি.বাক্ল-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বীয় বিবর্তন তত্ত্বে 'চারিত্রিক প্রবণতার পুরুষানুক্রমিক সম্প্রসারণ' (হেরিডিটারী ট্রান্সমিশন অব একোয়ার্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স) এবং

'বাহ্যিক পরিবেশের প্রভাব'(ইনফ্লুয়েন্স অব এক্সটার্নাল এনভার্নমেন্ট)-এ দু'টি ধারণা সংযুক্ত করেন।

স্পেনসার বিবর্তনবাদের কট্টর সমর্থক হলেও তাঁর বিবর্তনবাদ ডারউইনের মতো কেবল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে বিকশিত নয়। তাঁর বিবর্তন তত্ত্বের প্রথম পর্যায়ে কোলেরিজমের মাধ্যমে প্রাপ্ত জার্মান ভাববাদের প্রভাবে ঐশ্বরিক ও অতীন্দ্রিয় ধারণা উপস্থিত। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দ্বারা সৃষ্ট প্রভাব। ফলে একদিকে চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (এক্সট্রিম ইনডিভিজুয়ালিজম), আর অপরদিকে সামাজিক জৈববাদ (সোশ্যাল অরগানিজম) একত্রে এসে এক মৌলিক অসঙ্গতি,স্ববিরোধিতা ও অবাস্তবতা তৈরি করে।

রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণা

স্পেনসার এখানে যে যুক্তি দেখান, তা থেকে বোঝা যায় যখন মানুষের পক্ষে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে খাপ খাওয়ানো সম্ভব হয়, অর্থাৎ যখন শক্তি ও সমাজের ভিতর ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়, একমাত্র তখন পূর্ণাঙ্গ সমাজ প্রতিষ্ঠা পায়। স্পেনসারের বিবর্তন তত্ত্বে রাষ্ট্র ও সমাজ তুলনীয় হয়েছে জীবন্ত প্রাণীর(লিভিং অরগানিজম)-এর সঙ্গে। জীবন্ত প্রাণীর ন্যায় রাষ্ট্র দীর্ঘকাল যাবৎ পরিচালিত মন্থর ও সচেতন বিকাশের ফল। এটি কলকারখানায় প্রস্তুতকৃত যন্ত্রের ন্যায় কোনো বস্তু নয়। স্পেনসারের ভাষায় 'দি স্টেট ইজ এ গ্রোথ, এ্যান্ড নট এ ম্যানুফেকচার'। সামাজিক চুক্তি মতবাদ ও ঐশ্বরিক মতবাদের প্রচন্ড বিরুদ্ধাচরণ করে রাষ্ট্র সম্পর্কে স্পেনসারের এই মতবাদ। স্পেনসার মনে করেন, জীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা হচ্ছে যথাক্রমে মানুষের দেহ ও মনের বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা। অন্যদিকে সমাজ বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার এ সবের বিবর্তন বিষয়ে বিশ্লেষণ।

সরল থেকে জটিল

স্পেনসারের বিবর্তন তত্ত্বের মূলনীতি হচ্ছে সমগ্র প্রকৃতিতে ব্যতিক্রম ছাড়াই বিবর্তন নীতি ক্রিয়াশীল। প্রতিটি বস্তু বা প্রাণী তাই সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থার(ফ্রম সিম্পল টু কমপ্লেক্স) দিকে এগোয়। মানব সমাজও এই বিবর্তন নীতির ফল। বিবর্তনের কারণেই প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তু, জীব, জড় নির্বিশেষে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রগতিমুখী। কেননা এর ফলে প্রতিটি বস্তুই সমসাদৃশ্যের অবস্থা থেকে অসমসাদৃশ্যের অবস্থায় রূপান্তরিত হয়(ট্রান্সফর্মেশন অব দি হোমোজিনিয়াস ইন টু দি হেটেরোজিনিয়াস)। স্পেনসার তাই বিবর্তন ধারাকে আকস্মিক নয়, অবশ্যম্ভাবী বলে আখ্যা দেন(নট এ্যাজ এ্যান এ্যাক্সিডেন্ট বাট এ্যাজ এ নেসেসিটি)।

আধুনিক যুগে স্পেনসারের এই চূড়ান্ত ভারসাম্যের নীতিকে প্রত্যাখ্যান করেন বিজ্ঞানীরা। বিবর্তনের ধারা তাদের মতে স্তব্ধতা পায় না। এটা চির প্রবহমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় প্রতিটি 'সামঞ্জস্যায়ন'(এ্যাডাপটেশন) নব নব অবস্থা তৈরি করে এবং আবারও নতুন করে সামনে আসে 'সামঞ্জস্যায়নের' আবশ্যকতা। এটা 'adaptation, 'ad infinitum' অর্থাৎ সীমাহীন এক প্রক্রিয়া। এ ভাবে স্পেনসারের দর্শন ও রাজনীতিক চিন্তার কেন্দ্রীয় নীতিই পরিত্যক্ত হয়।

জীবদেহ ও সমাজদেহ

স্পেনসার জীবদেহের সঙ্গে সমাজদেহের সাদৃশ্য তুলে ধরলেও তাঁর দর্শনে এ উভয় 'অর্গানিজম'-এর বৈসাদৃশ্যও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। ফলে রাষ্ট্র কর্তৃত্ববাদীরা স্পেনসারের তত্ত্বকে তাদের চিন্তার অনুকূলে নিয়ে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং স্পেনসারের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদই স্পষ্টতর হয়েছে। সাদৃশ্যের পর সকল বৈসাদৃশ্য প্রদর্শন করে স্পেনসার যে বিষয়টি স্বচ্ছ করতে পেরেছেন তা হলো জীবদেহের অংশগুলো জীবদেহের সঙ্গে মিশে যায় এবং সমগ্র জীবদেহ এককভাবে যৌথ চেতনার(কর্পোরেট কনশাসনেস) অধিকারী

হয়ে একযোগে সুখ-দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু একেবারেই বিপরীতে সমাজদেহে সেটা ঘটে না। এখনে প্রত্যেক ইউনিট স্বতন্ত্র চেতনার (ইনডিপেন্ডেন্ট কনশাসনেস) অধিকারী। "ফ্রম লুথার টু হিটলার" গ্রন্থে ডব্লিউ এম. ম্যাকগভার্ন তুলে ধরেন যে, এ ভাবে সমাজের যৌথ চেতনার অস্বীকৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের কল্পিত কল্যাণে নয় বরং ব্যক্তির কল্যাণে ব্যক্তির টিকে থাকার নীতি সামনে আসে। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যক্তির উৎসর্গকরণ নয়, বরং ব্যক্তির প্রয়োজনে রাষ্ট্রকে উৎসর্গকরণই নীতি হয়ে দাঁড়ায়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও লেসেস ফেয়ার

এভাবে স্পেনসার বিবর্তনবাদী জৈবিক মতবাদী হয়েও শেষাবধি ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী হিসেবেই গৃহীত হন। তাঁর "স্যোশাল স্ট্যাটিক্স" সামাজিক জৈববাদের ব্লুপ্রিন্ট। আর তাঁর "দি ম্যান ভার্সাস দি স্টেট" নি:সংশয়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদদের ব্লুপ্রিন্ট। স্পেনসার পুরো রাষ্ট্রতত্ত্বকে বিশেষভাবে তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও অর্থনৈতিক 'লেসেস ফেয়ার' তত্ত্বকে প্রাকৃতিক অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত করেন। তাঁর মতে এ সব নীতি প্রগতির সঙ্গে সঙ্গতিমূলক।

স্পেনসারের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দর্শন তাঁর "দি ম্যান ভার্সাস দি স্টেট" গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। এই গ্রন্থের 'দি নিউ টোরিজম' প্রবন্ধে স্পেনসার ইংল্যান্ডের 'হুইগ', 'লিবারাল' এবং 'টোরী' বা 'কনজারভেটিভ'দের সামাজিক সংস্কার ও কল্যাণ রাষ্ট্রনীতি গ্রহণের বিরোধিতা করে একশো ভাগ 'লেসেস ফেয়ার' নীতি গ্রহণ করার দাবি তুলেছেন। স্পেনসার সামারিক রাষ্ট্র ও শিল্প রাষ্ট্র এই দুই ভাগে রাষ্ট্রকে ভাগ করে শিল্প রাষ্ট্রের পক্ষে স্বীয় মত দিয়েছেন। একই গ্রন্থের 'দি কামিং পেভারী' প্রবন্ধে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকে 'কৃত্রিমভাবে স্বাভাবিকের নিয়ন্ত্রণ' বলে কড়া সমালোচনা করে 'যোগ্যদের উদ্বর্তন' নীতিকে স্বাভাবিক নীতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন স্পেনসার। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি ও রাষ্ট্রের উদ্যোগে কাজ সমাধা ও সমস্যা সমাধানের ফলে মানুষ অভ্যাসবশত রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং নিজেদের উদ্যোগ, কর্মক্ষমতা ও স্বাধীনতা হারিয়ে 'নয়া দাসত্বে' আবদ্ধ হয়। এটা কেবল সমাজ কল্যাণ ব্যবস্থাকেই নয়, তৎকালে আসন্ন সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদেও ঘটবে বলে স্পেনসার মত দেন। 'দি সিন্স অব লেজিসলেটর্স' প্রবন্ধে স্পেনসার দেখান যে, সমাজের কোনো আবিষ্কার, উদ্ভাবন, প্রগতি, কল্যাণ, বিজ্ঞানের উৎকর্ষ এবং মানুষের জীবনোপকরণের উন্নয়ন সরকারী ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে হয়নি, অথচ এর পরও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সুযোগে মানুষের কল্যাণের ভান করে আইন প্রণেতারা আইন বানায়, না বুঝে মানুষের কল্যাণের নামে অকল্যাণ করে। এটাই স্পেনসারের ভাষায় আইন প্রণেতাদের পাপ।

এরপর "দি গ্রেট পলিটিক্যাল সুপারস্টিশন" প্রবন্ধে স্পেনসার পূর্বকালে রাজাদের দৈব অধিকারকে এভাবে পার্লামেন্টসমূহের দৈব অধিকার বলে আখ্যা দেন। প্রবন্ধে স্পেনসার অধিকার রাষ্ট্রের সৃষ্টি - এই মতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে জন লকের সাথে একমত হয়ে ঘোষণা দেন যে, অধিকার রাষ্ট্রের পুর্বে আসে (রাইট প্রিসিড্স দি স্টেট)। "দি গ্রেট পলিটিক্যাল থিংকার্স" গ্রন্থে ইউলিয়াম ইনেস্টেইন বলেন, এভাবে ১৮৪২ সনে "প্রপার স্ফীয়ার অব গভার্নমেন্ট" বই প্রকাশ থেকে আরম্ভ করে ১৯০৩ সালে মৃত্যু পর্যন্ত স্পেনসার সমাজ ও অর্থনীতির বিরাট বদল সত্ত্বেও চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রবক্তাই রয়ে যান।

মূল্যায়ন

হার্বার্ট স্পেনসার বিবর্তনবাদে অবদান রাখলেও তাঁর আসল পরিচয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হিসাবে। তিনি রাষ্ট্রকে কোনো কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান না বলে বিকাশের ফল বলে আখ্যা দেন। আজকে স্পেনসারের ব্যাখ্যার ন্যায় চরম ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ অপ্রয়োজনীয় ও বাতিল বিবেচিত হলেও সর্বাত্মকবাদ, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের প্রাবল্যে নিস্পিষ্ট মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নে এ দর্শন কার্যকারিতা রেখেছে। চেস্টার সি. ম্যাক্সীর ভাষায়, স্পেনসার ছিলেন ভিক্টোরিয়া যুগের ইংল্যান্ড ও আমেরিকার এরিস্টটল। স্পেনসার ছাড়া অপর কোনো দার্শনিক স্বীয় জীবনকালে এত বেশি প্রভাব ছড়াতে পারেন নি।

স্পেনসার রাষ্ট্রচিন্তায় অবদান রাখলেও তাঁর দর্শন ছিল পরস্পরবিরোধিতা, ভ্রান্তি, অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতিতে ঠাঁসা। তাঁর 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন', 'প্রাকৃতিক তথা স্বাভাবিক বাছাই নীতি' -

এসব বিবর্তনবাদী তত্ত্ব পরবর্তীকালে যেমন বিজ্ঞানেও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও। এগুলো যেমন ছিল অনৈতিক ও অযৌক্তিক, তেমনি অস্বাভাবিক ও অবাস্তব। এ ছাড়া জীববিজ্ঞান আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে যে একই জোয়ালে আবদ্ধ করা যায় না (ক্যান নট বি ইয়োকড্ টুগেদার) - এটা বোঝেন নি স্পেনসার। এদিকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সীমিত করতে গিয়ে স্পেনসার যে মত দেন, তাতে করে রাষ্ট্র অস্তিত্বহীনতার সামিল হয়ে পড়ে। অথচ সভ্য সমাজ রাষ্ট্র ব্যতিরেকে চলে না। আসলে উইলিয়াম গডউইন, টমাস হজকিন এসব নৈরাজ্যবাদী স্বাতন্ত্রবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় স্পেনসারের চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদও কার্যত নৈরাজ্যবাদের স্মারক হয়ে দাঁড়ায়। স্পেনসারের বুদ্ধিবৃত্তি বিরোধী বিবর্তনবাদী 'লেসেস ফেয়ার' ও চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এক সময়ে স্বৈরাচারের প্রতিপক্ষ হিসেবে উঠে এলেও সময়ের পরিক্রমায় আজ তা পরিত্যক্ত।

সারকথা

হার্বার্ট স্পেনসারের দর্শনে উপযোগবাদ, নন কনফর্মিজম, জার্মান ভাববাদ, লেসেস ফেয়ার,ডারউইন-পূর্ব বিবর্তনবাদ ও চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সম্মিলন ঘটেছে। অগাস্ট কোঁতের ন্যায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রভাব থাকায় তাঁর দর্শনকেও দৃষ্টবাদী বলা হয়। তার যোগ্যতমের উদ্বর্তন, প্রাকৃতিক বাছাই নীতি, খাপ খাওয়ানোর নীতি এবং লেসেস ফেয়ার তাকে শেষাবধি চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী করে তুলেছে। রাষ্ট্র কর্তৃত্বকে তিনি সীমিত করে প্রায় শূন্যের কোঠায় ঠেলে দেন। আজকে স্পেনসারের ব্যাখ্যার ন্যায় চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অপ্রয়োজনীয় ও বাতিল বলে বিবেচিত হলেও সর্বাত্মকবাদ, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের প্রাবল্যে নিষ্পিষ্ট মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নে এ দর্শন কার্যকারিতা রেখেছে। স্পেনসারকে ভিক্টোরিয়া যুগের ইংল্যান্ড ও আমেরিকার এরিস্টটল বলা হয়। স্পেনসার ছাড়া অপর কোন দার্শনিক স্বীয় জীবনকালে এত বেশি প্রভাব ছড়াতে পারে নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। হার্বাট স্পেনসার কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?

ক) জার্মানীতে; খ) ইংল্যান্ডে;
গ) ফ্রান্সে; ঘ) স্পেনে।

২। হার্বাট স্পেনসার কোন গ্রন্থে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের দর্শন তুলে ধরেন?

ক) সোশাল স্ট্যাটিকস; খ) প্রিন্সিপাল অব সোশিওলজি;
গ) দি ম্যান ভার্সাস দি স্টেট; ঘ) প্রিন্সিপল অব সাইকোলজি।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। স্পেনসার কি একজন বিবর্তনবাদী ছিলেন?

২। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। হার্বাট স্পেনসারের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তর : ১। খ, ২। গ